দুঃখের পাঁচালী

শ্রীমণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স্
২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট কলিকাতা

দাম দেড় টাকা

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্সের পক্ষে ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে
শ্রীগোবিন্দপদ ভট্টাচার্য্য দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত
২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা

দুঃখের পাঁচালী

পরিচয়

বাঙ্গালীর জীবন-যাত্রায় জটিলতাব আজ অন্ত নাই। আত্ম-মর্য্যাদাশীল শিক্ষিত কৃতবিদ্য কর্ম্মক্ষেত্রে স্থান পায় না। সর্ব্ব-গুণান্বিতা বধূর গুণের আদর নাই, দুঃখ তাহাব প্রচুর। সঞ্চয় যেখানে আছে, শান্তির অভাব—নিষ্ঠার অবমাননা। বেকার তাহার উপার্জ্জনের পথ খুঁজিয়া লইতে অক্ষম।—বাঙ্গালী-জীবনের এই সমস্যাগুলি কথা ও কাহিনীর ভিতর দিয়া যথাক্রমে বঙ্গশ্রী, তপোবন, প্রবর্ত্তক এবং মাসিক বসুমতীতে আত্মপ্রকাশ করে। আজ সেগুলি দুঃখের পাঁচালীর আকারে পরিপূর্ণরূপে প্রকাশিত হইল।

যে বাস্তব 'মডেল'গুলি আদর্শ করিয়া অবাস্তব পবিচয়ের 'গ্রাউণ্ডে' এই পাঁচালীর চিত্রগুলি আঁকিয়াছি—তাহাদের অধিকাংশই এখনো কর্ম্মক্ষেত্রে বর্ত্তমান। যদি তথাকথিত কাহারো চক্ষুতে এ চিত্র পড়ে, মুকুরের প্রয়োজনই সার্থক করিবে। সমস্যা-গুলি সমাধানের যে প্রচেষ্টা ইহাতে হইয়াছে, পাঠক পাঠিকাগণের প্রীতিপ্রদ হইলেই গ্রন্থকারের পরিকল্পনা সার্থক হইবে।

রাসপূর্ণিমা, ১৩৪৪
আরিয়াদহ, ২৪ পরগণা

শ্রীমণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়

সমর্পণ

গৃহস্থাশ্রমে লিপ্ত থাকিয়াও
যিনি সাধকোচিত দুর্লভ গুণগ্রামে বিভূষিত
সত্যনিষ্ঠা ও সহিষ্ণুতা—সরলতার সংস্পর্শে
যাঁহার চিরমধুর সুনির্ম্মল চিত্তকে অনবদ্য করিয়াছে
লোভ যাঁহাকে লালায়িত করিতে পারে নাই
স্নেহ যাঁহার চিত্ততলে ফল্গুর মত সঞ্চিত
অন্তরের দরদ দিয়া আত্মীয় অনাত্মীয় সকলকেই
যিনি আপনার করিয়া লইয়াছেন
সৎসাহিত্যের রসগ্রহণ করিয়া সাহিত্যরসিকরূপে
সেকাল ও একালের ভাবধারার যিনি সাক্ষী
সেই ঋষিকল্প সুধী শ্রদ্ধাভাজন মণীষী
শ্রীযুক্ত সূর্য্যকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের
প্রাতঃস্মরণীয় নামের সহিত যোগসূত্র রক্ষা করিতে
পুত্রস্থানীয় স্নেহধন্য জামাতার

দুঃখের পাঁচালী

ভক্তি-অর্ঘ্যরূপে সমর্পিত হইল

দুঃখের পাঁচালী

সাহিত্য-সেবীর

এক

ন্যাংটার নেই বাটপাড়ের ভয়,—এই পরিচিত প্রবচনটির মোড় ফিরাইয়া দিয়াছিল রীতিমত কাপড়চোপড়-পরা, স্ত্রী-পুত্র-পরিজনঘেরা গৃহের মালিক উপেন চৌধুরী।

তিনটি ছেলে, পাঁচটি মেয়ে, স্ত্রী ও সকন্যা বিধবা বোন—এতগুলি প্রাণী যাহার পোষ্য, বর্ত্তমান প্রসঙ্গে সে যেমন নিশ্চিন্ত ও নির্ব্বিকার, ভবিষ্যৎ সম্বন্ধেও সেই পরিমাণ উদাসীন। উপায় যাহা করে, বুঝিয়া খরচ করিলে তাহাতে সাংসারিক সুসার হওয়া দুরূহ নয়, কিন্তু উপেন তাহার ধার দিয়াও যায় না। পাড়ার লোকে ও আত্মীয়-পরিজনেরা বলে, তাহার হাতে টাকা আসিলেই তাহার পাখা গজায়—দেখিতে দেখিতেই উড়িয়া যায়। অথচ, সে যে কখনও কোনও বদখেয়ালী করিয়া টাকা উড়াইয়াছে বা নিষিদ্ধ নেশাগুলির সহিত তাহার ঘনিষ্ঠতা আছে, একথা তাহার শত্রুরাও জোর করিয়া বলিতে পারে না।

তথাপি, খরচ সম্বন্ধে উপেনের খেয়ালের অন্ত নাই। হয় তো পথ দিয়া চলিয়াছে, দেখিল, উদম-গা একটা ছেলে খাবারের দোকানের সামনে দাঁড়াইয়া একখানি জিলাপীর জন্য কান্না জুড়িয়া দিয়াছে; দোকানের মালিকের তাহাতে ভ্রূক্ষেপ নাই, খাবারের মধ্যে বসিয়া যাহারা বিক্রয় ও খবরদারী করে, তাহারা ভ্রূকুটি

করিয়া তাড়া দেয়; চক্ষুর উপর এ দৃশ্য পড়িলে উপেন কিন্তু উপেক্ষা করিতে পারে না; গাঁটের পয়সা খরচ করিয়া ছেলেটিকে খাবার খাওয়াইয়া তবে সে নিশ্চিন্ত হইবে। কিন্তু, নিজের পকেট যদি সেদিন শূন্য থাকে, সমস্ত দিনটিই তাহার অশান্তিতে কাটে, বুভুক্ষু ছেলেটির মুখখানি তাহার চক্ষুর উপর ভাসিতে থাকে।

তাহার যে কাজ অনেকেই সেই সূত্রে তাহার সহিত বাসায় দেখা করিতে আসে। হাতে জরুরী কাজের ঠেলা থাকিলেও সে কাহাকেও অবহেলা করিতে পারে না। বরং, লোকজন বাড়ীতে আসিলে সে তাহাতে আনন্দ পায় এবং অভ্যাগতদিগকে শুধু মুখের আদরে নয়—পান-ভোজনে আপ্যায়ন করাও যেন তাহার একটা সংস্কার ও ইহাতেই তাহার অপরিসীম তৃপ্তি।

সাহিত্যিকরূপে প্রতিষ্ঠালাভ করিলেও সাহিত্যের কোনও আসরে কেহ কোনও দিন তাহাকে যোগ দিতে দেখে নাই। সাহিত্য-সম্মেলনের বড় বড় অধিবেশনগুলিও সে যেন অতি সন্তর্পণে এড়াইয়া যায়। কোনও সভা বা সংস্থায় উপেন চৌধুরী কোনও দিন চাঁদা দিয়াছে, এমন কথা সাহিত্যিক মহলে কেহ কখনও শুনে নাই। কিন্তু, কোনও সাহিত্যিকের সহসা ভাগ্যবিপর্য্যয় উপস্থিত হইলে, কিংবা কোনও দায় দফা বা আপদ্-বিপদ্ আসিলে তাহার সহায়তায় উপেনের আন্তরিকতার অন্ত থাকে না। সভা-সমিতিতে মাসে চারি আনা চাঁদা দিতেও যে লোক কুণ্ঠিত, কোনও সাহিত্যিকের সহায়তাসূচক অনুষ্ঠানে, জলসা বা অভিনয়ের আসরে তাহাকেই সর্ব্বাগ্রে উচ্চশ্রেণীর টিকিট কিনিতে ব্যগ্র দেখা যায়।

এ সম্বন্ধে কেহ কোনও প্রশ্ন করিলে উপেন সহজ কণ্ঠেই উত্তর

দেয়—যার যাতে অনুরাগ, তাতেই তার লেগে যাওয়া উচিত, এর মধ্যে কোনও তর্কই নেই। আমার মনে হয়, খাওয়াটাই মানুষের সব চেয়ে বড় সমস্যা। সাহিত্যের সভায় মনের খোরাক যোগাবার অনেক কথাই সাহিত্যের প'গুারা বলেন, কিন্তু সাহিত্যিকদের পেটের খোরাক সম্বন্ধে কোন কথাই কেউ কোনদিন তোলেন না। আমার কিন্তু যত কিছু ভাবনা এই বিষয়বস্তুটি নিয়েই, কাযেই এই পথেই আমার যা কিছু সাধনা।

ভাবের মুখে সাধকেরা বহু তত্বকথাই বলিয়া আসিয়াছেন। সাহিত্যসাধক উপেনের এই উচ্চ ভাবের কথাগুলি বিশ্লেষণ করিলে ইহাই বলিতে পারা যায় যে, সাহিত্যের পথে সাধনা তাহার যতই কঠোর হৌক, অন্যের খোরাকের অভাব সময়ে অসময়ে তাহার সাধনার বিঘ্ন তুলিলেও, নিজের সংসারের খোরাকীর দুশ্চিন্তা কোনও দিন সেখানে প্রবেশাধিকার পায় নাই। পাইলে, আজ তাহার এ দুর্দ্দশা হইত না।

দুই

বিশ্ববিদ্যালয়ের তৃতীয় দরজাটি পার হইয়া কনভোকেশনের দরবারে দাঁড়াইবার বহুপূর্ব্বে উপেন তাহার সহজাত সাধনায় সাহিত্যের আসরে বসিবার যোগ্যতা অনায়াসেই আয়ত্ত করিতে পারিয়াছিল। নবলব্ধ বি-এ উপাধির খ্যাতি তাহার আত্মীয়-স্বজনকে যে পরিমাণে তুষ্ট করিয়াছিল, উপেন তাহাতে বিশেষ

কোনও গৌরব উপলব্ধি করে নাই বা তাহার নামের শেষে উপাধির অক্ষর দুইটি যোগ করিতে কেহ কোনও দিন তাহাকে দেখে নাই।

উপেনদের অবস্থা তখন মোটের উপর মন্দ নয়। নূতন উঠতির সময়। বাবা জমিদারী সরকারের গোমস্তাগিরি করিয়া মাথার চুল যেমন পাকাইয়াছিলেন, সেই সঙ্গে বিষয়-আসয ও বহু জমিজেরাৎ অর্জ্জন করিয়া ছেলেদের উপার্জ্জনের পন্থা পরিষ্কার করিয়া দিতে ব্যস্ত ছিলেন। বড়ভাই আদালতের সেরেস্তদার, বেশ দু'পয়সা উপার্জ্জন করিতেন। মধ্যম এক প্রসিদ্ধ চটকলের টাইম-কীপার; মাসিক মাহিনা তাহার যৎসামান্য, বাইশ টাকার বেশী নয়, কিন্তু সাপ্তাহিক উপরি উপার্জ্জন তাহার অসামান্য, অষ্টগুণেরও উপর। পাটের কলে পয়সার এই প্রাচুর্য্য দেখিয়া উপেনের বুদ্ধিমান্ বাবা কনিষ্ঠ দুই সন্তানকে স্কুল হইতে অসময়ে নাম কাটাইয়া পয়সা উপার্জ্জনের ফন্দী শিখিতে পাটকলের আফিসের হাজীরাখাতায় নাম লিখাইয়া দিয়াছিলেন। মুরুব্বীর জোর থাকায় তাহাদেরও গতি-মুক্তির যথোচিত ব্যবস্থা হইয়া গিয়াছিল।

চারি পুত্রই ছিল পরম পিতৃভক্ত। প্রজা ঠেঙাইয়া নানা উপায়ে পিতার প্রচুর উপার্জ্জন তাহারা দেখিয়াছে, সুতরাং পিতার প্রস্তাব শুনিয়াই শিক্ষার পথ ছাড়িয়া উপায়ের পথে পাড়ি দিতে কেহই দ্বিধা তুলে নাই; কিন্তু, গোল বাধিয়াছিল বিদ্রোহী পুত্র উপেনকে লইয়া।

পিতার ইচ্ছা, এ পুত্রটিও চাকুরীতে ঢুকিয়া পড়িয়া তাঁহার আমদানীর অঙ্ক বাড়াইয়া দেয়; কিন্তু চাকুরীর উপর পুত্রের একান্ত

বিতৃষ্ণা, সে নানা অজুহাতে সে প্রস্তাব কাটাইয়া বিচক্ষণ রাসভারী পিতাকেও অবাক্ করিয়া দিয়াছিল।

আই-এ পরীক্ষার ফল বাহির হইতেই পিতার জেদ আরও বাড়িয়া যায়। মধ্যম ভ্রাতা এই সময় জানাইয়াছিল, সাহেব একজন ইংরাজী-জানা অ্যাসিষ্টাণ্ট খুঁজছেন; বড়বাবু কাজের হলে কি হবে, ভাল ইংরাজী জানে না। উপেন যদি এ কাজে ঢোকে, দু'দিন বাদে সে-ই হবে বড়বাবু।

বৃদ্ধের মুখ তখন লোভে উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছিল, মিলের বড়বাবু! বছর কতক টিকিয়া সরদাবদের ওপর খবরদারী করিতে পারিলেই একেবারে বড়মানুষ। কিন্তু, এই যুক্তি দর্শাইয়াও শিক্ষিত পুত্রকে চাকুরীতে ঢুকাইতে পারা যায় নাই। একে চাকুরীর উপর তাহার চিরদিনই ঘৃণা, তাহাতে আবার পাটকলের বড়বাবুর পাযা! অবজ্ঞায় মুখখানা কুঞ্চিত করিয়া সে জবাব দিয়াছিল, আমার দ্বারা ও-কাজ হবে না, আমি বি এ পড়ব।

বিচলিত হইয়া পিতা তখন বলিয়াছিলেন, একেই বলে হাতের মোয়া ছেড়ে মুড়ির আশায় ছোটা। বি-এ ত' পড়বে, কিন্তু খরচ যোগাবে কে? এর পর আমি এক পয়সাও তোমার পড়ার পেছনে দিতে পারব না।

কিন্তু, পিতার এ দৃঢ়তাও পুত্রকে সঙ্কল্পচ্যুত করিতে পারে নাই, উদ্দীপ্ত কণ্ঠে সে পিতার মুখের উপর কোনও তীব্র বক্তৃতা না দিয়াই অতি সংক্ষেপে মৃদুস্বরেই শুধু বলিয়াছিল, আপনার আশীর্ব্বাদ থাকলে আমার পড়াশুনা আটকাবে না।

উপেনের অদৃষ্টে তখন বিদ্যালাভ ছিল, সুতরাং পড়া-শুনা

আটকায় নাই। ইহার গোড়াতেও ছিল সেই বয়সের সাহিত্য-সাধনা। সাহিত্য-জগতে সমাজপতি মহাশয়ের তখন রীতিমত দপদপা, উপেন ছিল তাঁহার লেখার পরম ভক্ত এবং সেই সূত্রে সে নিজের প্রিয়দর্শন চেহারা, শিষ্ট ব্যবহার ও সহজাত সাহিত্য-প্রতিভার সুপারিশে সেই দুর্ম্মুখ সাহিত্যিক দুর্ব্বাসার স্নেহটুকুও পূর্ণমাত্রায় আয়ত্ত করিয়া লইয়াছিল। সমাজপতির সহায়তায় সাহিত্যে হাত মক্স করিবার সুযোগ পাইয়া সাহিত্যের দুর্গম পথে প্রবেশ করিবার সন্ধানটুকুও সে জানিতে পারিয়াছিল।

উপেনের পক্ষে অগতির গতি তখন সমাজপতি। চাকুরী করা সম্বন্ধে বাড়ীর ব্যাপারটা তাঁহাকে খুলিয়া বলিতেই তরুণের উৎসাহে তিনি উপেনের কাঁধটির উপর তাঁহার স্থূল দীর্ঘ হাতখানির একটা ঝাঁকুনি দিয়া বলিয়াছিলেন,—বাঃ। এই ত চাই! এমন না হলে ছেলে! বেশ করেছ; সুরেশ সমাজপতির সাকরেদী যে দুদিনও করেছে, পাটের কলে সে কোন দিন কলম পিশতে যেতে পারে না।—যাদৃশী ভাবনা যস্য সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী,—তোমার রাস্তা আলাদা; তাই এই বয়সেই সেটাকে মনে মনে বেছে নিয়েছ। পড়া-শুনা তোমার আটকাবে না।

শুধু মুখের কথা নয়, কথামত ব্যবস্থা করিতে কি আগ্রহই না তাঁহার দেখা গিয়াছিল। মা পুত্রকে অসময়ে বাহির হইতে দেখিয়া বলিয়াছিলেন, থাবার যে তৈরী, খেয়ে-দেয়ে বেরুলে হ'ত না, বাবা!

শরণাগতের কলেজে পড়ার ও মেসে থাকার গুরু ভারের বোঝাটি তখন ছেলের মাথায় চাপিয়া বসিয়াছিল, সুতরাং উত্তর

আসিয়াছিল,—আগে উপেনের পড়ার ব্যবস্থাটা করে আসি মা, তারপর খাবার কথা, উপেনকে নিয়ে দুজনে ; এক সঙ্গেই খাব।

ব্যবস্থা হইতে বিলম্ব হয় নাই। উপাধ্যায় ব্রহ্মবান্ধব বলিয়াছিলেন,—সন্ধ্যার পর উপেন ঘণ্টা দুই 'সন্ধ্যা'র জন্য খাটবে, মেসের খরচটা আমি চালিয়ে দেব।

সি. আর. দাস মহাশয়—তখনও তিনি দেশবন্ধু হন নাই—সমাজপতির প্রস্তাবে সানন্দে জানাইয়াছিলেন—বই-টই কেনবার খরচ ও কলেজের মাইনে বরাবর আমার কাছে থেকে তুমি নিয়ে যেয়ো।

সুতরাং সে সময় সমাজপতি মহাশয়ের চেষ্টা-যত্নে উপেনের পড়াশুনা ও সাহিত্য-সাধনা এক সঙ্গেই সুশৃঙ্খল গতিতে চলিয়াছিল। অতঃপর পিতার নিকট হইতে কোনও সহায়তা সে পায় নাই এবং কোনও দিন প্রার্থনাও করে নাই। তথাপি অবকাশ পাইলেই বাড়ী গিয়া পিতার চরণে ভক্তি নিবেদন করিতে ও কলিকাতায় থাকিবার সময় চিঠিপত্রে কুশল সমাচার লইতে কখনও তাহার পক্ষ হইতে কোনও ত্রুটি দেখা যায় নাই।

পিতার কোন সহায়তা না পাইয়াও যথা-সময়ে বি. এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া উপেন প্রথমেই পিতার চরণতলে বসিয়া শ্রদ্ধা নিবেদন করিতে অবহেলা করে নাই—ভক্তিগদ্‌গদ্ স্বরে সে জানাইয়াছিল, আপনারই আশীর্ব্বাদের জোরে আমি কৃতকার্য্য হয়েছি, বাবা।

কিন্তু, তথাপি নিয়তিনির্দ্দেশেই যেন পিতাপুত্রের মধ্যে ব্যবধানের এক দুর্লঙ্ঘ্য প্রাচীর উঠিয়া পরস্পরকে চিরজীবনের মত বিচ্ছিন্ন করিয়া দিয়াছিল।

অর্থের অভাব না থাকিলেও অর্থের মোহ উপেনের পিতাকে একেবারে অভিভূত করিয়া ফেলিয়াছিল। অবৈধভাবে উপরি উপায়ে যাহারা অভ্যস্ত, প্রজার নিকট প্রাপ্য ন্যায্য পাওনার উপর নানাবিধ অন্যায্য পাওনার জায় জুড়িয়া যাহারা হীন স্বার্থকে স্ফীত করিতে একান্ত ব্যগ্র, সুদের টাকা সিন্দুকে তুলিবার সময় যাহাদের স্রক্কণী দিয়া লালা নিঃসৃত হয়,—অর্থের মোহ তাহাদের মনোবৃত্তিকে এমনই নিম্নগামী করিয়া দেয় যে, উপরের দিকে উঠিবার সামর্থ্য-টুকুও সেই সঙ্গে নিঃশেষ হইয়া যায়। বরং, অর্থানুসরণে নিম্নে নামিবার তাহাদের এই দুর্ব্বার গতির পথে অতি প্রিয়জনও যদি প্রতিবন্ধক হইয়া উঠে, তাহাকেও চূর্ণ করিতে ইহারা কিছুমাত্র দ্বিধা করে না।

আর সব ছেলেরা সম্পূর্ণ বাধ্য থাকিয়া বংশের নাম-ডাক, বাড়ীর শ্রী-ছাঁদ ও তাঁহার তহবিলের ভার দিন দিন বাড়াইয়া চলিয়াছে, শুধু এই অবাধ্য ছেলেটিই বেপরোয়ার মত তাঁহার আয়ত্তের বাহিরে গিয়া দাঁড়াইয়াছে,—এই ক্ষোভ বৃদ্ধের মনে সর্ব্বক্ষণই ব্যথা দিতেছিল। কিন্তু, এই শ্রেণীর বৃদ্ধদের কূট বুদ্ধির তীক্ষ্ণতাও অসাধারণ। প্রখর বুদ্ধি অবিলম্বেই এমন একটা উপায়-রজ্জুর পরিকল্পনা করিয়া বসিল, যাহা সহস্রাধিক নগদ টাকা ও প্রচুর সামগ্রীর সহিত একটি সালঙ্কারা বধূকে বাঁধিয়া আনিতে ও পাস-করা উন্মনা পুত্রকে গৃহমার্গে আকর্ষণ করিতে—এক ঢিলে দুটি পাখীকে কাবু করিবার মত অব্যর্থ।

ইহার কিছুদিন পরেই পুত্রকে স্তব্ধবিস্ময়ে পিতার স্বহস্তলিখিত এই মর্ম্মের এক আদেশ-পত্র পড়িতে হইয়াছিল,—"আমাদের পাশের

গ্রামের আশুতোষ রায়ের সুন্দরী কন্যার সহিত তোমার শুভবিবাহের কথাবার্ত্তা এক প্রকার পাকা হইয়া গিয়াছে। এই মাসেই শুভ-কার্য্য সমাধা করিবার বাসনা। যদি আমার প্রতি তোমার কিছুমাত্র শ্রদ্ধাভক্তি থাকে, তাহা হইলে কদাচ ইহাতে অন্যথা করিবে না। যেহেতু কথা আমি দিয়াছি। সত্বর বাড়ীতে আসা চাই।

ইহার পরদিনই পাশের গ্রামের আশুতোষ রায় মহাশয় স্বয়ং উপেনের বাসায় আসিয়া তাহার হাত দুইখানি ধরিয়া আর্ত্তস্বরে জানাইয়াছিলেন,—তুমি আমার কুল রক্ষা কর বাবা, আমি একেবারে দায়ে পড়ে ডুবতে বসেছি!

সবিস্ময়ে বৃদ্ধের অশ্রুপূর্ণ মুখখানির দিকে চাহিয়া উপেন জিজ্ঞাসা করিয়াছিল,—কি হয়েছে বলুন ত?

বৃদ্ধ ব্যাকুল ভাবে যাহা বলিয়াছিলেন, তাহার মর্ম্ম এই যে, বিবাহের কথাবার্ত্তা যদিও পাকা হইয়া গিয়াছে, কিন্তু টাকার কোনও ব্যবস্থা সে পর্য্যন্ত হইয়া উঠে নাই এবং তাহার সম্ভাবনাও অল্প। প্রথম কন্যার বিবাহে তাঁহার জমিজেরাৎ সব বাঁধা পড়িয়াছে, এবার ভদ্রাসন বাঁধা দিয়া তাঁহাকে পণের টাকা সংগ্রহ করিতে হইবে। কিন্তু, তাহা সময়সাপেক্ষ। শুভকার্য্য যাহাতে আগামী মাসে সম্পন্ন হয়, সে সম্বন্ধে তিনি উপেনের পিতাকে বিশেষ অনুরোধ করিয়াছিলেন। কিন্তু, কর্ত্তা তাহাতে আপত্তি করিয়া বলিয়াছেন, বিবাহ এই মাসেই হওয়া চাই; ও-মাসে হওয়া সম্বন্ধে ছেলের বিশেষ আপত্তি। কন্যাদায়গ্রস্ত নিরুপায় পিতা অগত্যা ছেলের আপত্তিটুকু কাটাইবার জন্য তাহার মেসে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন।

অর্থের দিক্ দিয়া পিতার মনোবৃত্তির পরিচয় যদিও উপেনের অবিদিত ছিল না, কিন্তু তাহাকে উপলক্ষ করিয়া বিবাহসূত্রে এই ভাবে অর্থসংগ্রহের প্রচেষ্টা তাহার কোমল মনটির উপর সেদিন কঠোর আঘাত দিয়াছিল। বরাবরই সে পণপ্রথার বিরোধী, এই নিষ্ঠুর প্রথার প্রতিকূলে গল্প-প্রবন্ধ-কবিতায় কলমের কত তীক্ষ্ণ খোঁচাই সে দিয়াছে; অথচ তাহারই বিবাহের ছলে তাহার পিতা দস্যুর মত ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিয়াছেন বৈবাহিকের যথাসর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করিতে! উপেন চিন্তা করিবার কোন অবসর না লইয়াই বৃদ্ধ রায় মহাশয়কে তৎক্ষণাৎ দৃঢ়স্বরে আশ্বাস দিয়াছিল,—বাবার কথা রদ করবার ক্ষমতা ত তার নেই, কাযেই এই মাসেই বিবাহ হবে। তবে, আপনাকে বাড়ীর ভদ্রাসন বাঁধা দিতে হবে না, দেওয়া-থোওয়ার ব্যাপার বাদ দিযেই বিনা আড়ম্বরে আপনি বিবাহের আয়োজন করুন।

অশ্রু সম্বল করিয়া বৃদ্ধ আসিয়াছিলেন কলিকাতার মেসে ছেলের হৃদয় বিগলিত করিতে। কিন্তু, ছেলের কথায় তাঁহারই চিত্ত বিগলিত হইয়া সঞ্চিত অশ্রু উদগ্র আনন্দ-প্রবাহে মিশিয়া গিয়াছিল। এ অশ্রুমাধুর্য্য ভুক্তভোগী ভিন্ন অন্যে উপলব্ধি করিতে পারে না।

বৃদ্ধকে বিদায় দিয়া উপেন সেইদিনই পিতার পত্রের উত্তর এই ভাবে দিয়াছিল,—বিবাহ সম্বন্ধে যে আদেশ করিয়াছেন, তাহা শিরোধার্য্য করিয়া এই প্রার্থনাটুকু জানাইতেছি, কোনওরূপ পণের সহিত আপনার পুত্রের এই পরিণয়ের কোনও সংস্রব না থাকে; বিনাপণে কুলবধূ গ্রহণ করিয়া এই নিষ্ঠুর-প্রথা-পীড়িত সমাজে

আপনিও একটা আদর্শ রক্ষা করেন, এইটুকুই অনুগত পুত্রের অন্তরের কামনা।

তিন দিন পরেই উপেনের পিতা অনুগত পুত্রের অন্তরের কামনাটুকু পূর্ণ করিতে এইভাবে ব্যবস্থা দিয়াছিলেন, বরাবরই লক্ষ্য করিয়া আসিতেছি, কোনও বিষয়েই তুমি আমার মতানুবর্ত্তী নহ। যে প্রথা আমাদের সমাজে অবাধে প্রচলিত, তোমার বিচারে তাহা অন্যায়, তাহা নিষ্ঠুরতামাত্র। সুতরাং তোমার ন্যায় ন্যায়নিষ্ঠ সন্তানের কর্ত্তব্য, আমাদের সংস্রবে না থাকা। অতএব, এই পত্রদ্বারা আমি তোমাকে ত্যাজ্যপুত্র করিতেছি। আমার অবর্ত্তমানেও পৈতৃক সম্পত্তিতে তোমার কোনও স্বত্ত্ব বর্ত্তাইবে না ; এ সম্বন্ধে আইনসঙ্গত ব্যবস্থা করিতেও আমি ত্রুটি করিব না, জানিবে।

চিরজীবনের মত পিতৃস্নেহ হইতে বঞ্চিত হইবার এই চরম ব্যবস্থায় পুত্র অল্প আঘাত পায় নাই ; কিন্তু পত্রের শেষভাগে সম্পত্তি সম্বন্ধে পিতার বিধিনির্দ্দেশ তাহার ব্যথাতুর মনটির ভিতরেও হাস্যরসের সঞ্চার করিয়াছিল। সে তখন নিজের মনে অস্ফুটস্বরেই প্রশ্ন করিয়াছিল,—বাবা বর্ত্তমান থাকতে, তাঁর স্নেহটুকু হারিয়ে, তাঁর অবর্ত্তমানে সম্পত্তির লোভটুকু আমি ত্যাগ করতে পারব না, এই ধারণা নিয়ে তিনি আমার বিচার করেছেন ?

পিতা-পুত্রের চিরবিচ্ছেদ ও প্রচুর পৈতৃক সম্পত্তি পরিত্যাগের ইহাই মর্ম্মস্পর্শী ইতিহাস। কিন্তু, উপেন রায় মহাশয়কে যে প্রতিশ্রুতি দিয়াছিল, তাহা যথাসময়েই রক্ষা করিতে কিছুমাত্র অবহেলা করে নাই।

সমাজপতি মহাশয় পিঠ চাপড়াইয়া পুনরায় তাহাকে উৎসাহ দিলেন, সংবাদপত্রের সম্পাদকগণ মুক্তকণ্ঠে উদীয়মান সাহিত্যিক উপেন চৌধুরীর সৎসাহসের প্রশংসা করিয়াছিলেন। বিভিন্ন সাময়িক পত্রে উপেনের ছবি পর্য্যন্ত ছাপা হইয়া যায়। সমাজপতি স্বয়ং উদ্যোগী হইয়া তাহার বিবাহের ব্যবস্থা করেন। চাঁদা করিয়া টাকা তুলিয়া শুভবিবাহ ও বরানুগমনের ব্যয় নির্ব্বাহ হয়। বিভিন্ন বয়সের বাছা বাছা বাইশজন সাহিত্যিক উপেনের বিবাহে বরযাত্রী হইয়া একটা স্মরণীয় আদর্শ রক্ষা করিয়াছিলেন।

বিবাহের পর ছোট একখানি বাড়ী ভাড়া করিয়া এই নবীন দম্পতির ক্ষুদ্র সংসারটি প্রতিষ্ঠা ও তাহাকে স্বচ্ছলভাবে চালাইবার ব্যবস্থা সম্বন্ধেও সাহিত্যিকগণ উদ্যোগী হইয়াছিলেন।

উপেনের প্রতিভা ছিল, সাহিত্যরথীরা তাহাকে রথও দিয়াছিলেন, নিপুণ হাতে রথ চালাইয়া সাহিত্যের দুর্গম পথটুকু অতিক্রম করিয়া সুরম্য মন্দিরে সে সহজেই প্রবেশ করিয়াছিল। কমলাও তাহার প্রতি প্রসন্না হইয়া সংসারে অচলা হইয়াছিলেন। এই যুগের কঠোর সাধনায় এই অধ্যবসায়ী যুবা যশ, অর্থ, গৃহ, প্রতিষ্ঠা, সুনাম, সম্মান—যেগুলি মানুষের সম্ভ্রম-সৌভাগ্যের মাপকাঠি, সে সমস্তই অধিকার করিয়া বহু লব্ধপ্রতিষ্ঠ সাহিত্যিকের চিত্তেও চাঞ্চল্য তুলিয়াছিল। সুসময়ে কিছুরই অভাব থাকে না; পুত্র, পরিজন, আত্মীয়, অভ্যাগত, বন্ধু বান্ধবের সমাগমে উপেনের সংসার তখন জমজমাট।

কথায় বলে, যার কর্ম্ম তারে সাজে, অন্য লোকে লাঠি বাজে। এই প্রবচনটিও অতঃপর উপেনের সম্বন্ধে হুবহু খাটিয়া গিয়াছিল,

তাহার জমজমাট সংসারে বিষম আঘাত দিয়াছিল। সাহিত্যে নিজের দুর্ব্বার প্রতিষ্ঠা দেখিয়া বিষয়-বুদ্ধিহীন কতিপয় হিতৈষীর প্ররোচনায় উপেন চৌধুরী নিজেই গ্রন্থপ্রকাশের এক কারবার ফাঁদিয়া বসে। কাগজ কলমে মানুষের চরিত্রসৃষ্টি ও মনস্তত্ত্বের নির্দ্দেশ দেওয়া, আর চেয়ারে বসিয়া জীবন্ত মনস্তত্ত্বের অধিকারীদের লইয়া ঘষামাজায় অনেক তফাৎ। যে কয় বৎসর কারবারের উপর অনুকূল বায়ু বহিয়াছিল, উপেনের বন্ধুরা স্বার্থের দিকে চাহিয়া ঠিক তাহার তালে তালেই পা ফেলিতেছিল, কিন্তু প্রতিকূল বাতাস বহিতেই একে একে সকলেই তফাতে সরিয়া গেল। কারবারের চাকা চালাইতে বসিয়া, উপেন নূতন সৃষ্টির সন্ধানে কলম চালাইবার আর অবসর পাইত না। যে সাধনা তাহাকে সিদ্ধি দিয়াছিল, সেই সাধনার প্রতি অশ্রদ্ধায় তাহার দুর্লভ প্রতিষ্ঠাটুকুও ক্ষুণ্ণ হইয়া পড়িল। কারবারের পাঠ তুলিয়া দিয়া উপেন যখন রিক্ত হইয়া ঘরে ফিরিয়া গেল, তখন কারবারের উদ্দাম বন্যায় তাহার ঘরের যাহা কিছু সংস্থান, সমস্তই ভাসাইয়া লইয়া গিয়াছিল।

উপেনের উঠতির সময় বঙ্গসাহিত্যও সমৃদ্ধ হইয়া উঠিয়াছিল; তাহার পতনের সঙ্গে সঙ্গে বিশ্বব্যাপী আর্থিক অভাবের ফলে সাহিত্য ভাগীরথীতেও ভাঁটা পড়িয়াছিল। উপেন ভাবিয়াছিল, আবার নবীন উদ্যমে অবিশ্রান্তভাবে কলম চালাইয়া পাড়ি জমাইবে, কিন্তু দেখিল, সেদিন চলিয়া গিয়াছে। কয়েক বৎসর পূর্ব্বেও যাহারা টাকা লইয়া লেখার জন্য উমেদারী করিত, উপেন এখন নিজেই তাহাদের দ্বারস্থ হইয়া অগ্রিম লেখা দিয়া টাকার জন্য হাঁটাহাঁটি করে। উপেন এতদিনে উপলব্ধি করিতে পারিয়াছিল,

চাকা চিরদিনই ঘুরিতেছে ; আজ যে উপরে, দুই দিন পরে তাহাকেই নামিতে হয় নীচে ! চক্রবৎ পরিবর্ত্তন্তে দুঃখানি চ সুখানি চ ।

তিন

উপেনের সংসারে কমলা যখন মুখ ফিরাইয়া বসিয়াছিলেন, মা-ষষ্ঠী তখন প্রসন্নমুখে তাহার দিকে চাহিয়াছিলেন। গৃহে অন্নবস্ত্রের নিত্য অভাব থাকিলেও পুত্রকন্যাদের কলহাস্যের অভাব ছিল না। সহধর্ম্মিণী অভয়া বিবাহের রাত্রে শুভদৃষ্টির সময় হইতে স্বামীর উদ্দেশে এ পর্য্যন্ত বরাবর একটানা শ্রদ্ধা নিবেদন করিয়া আসিয়াছে। এই দেবতুল্য মানুষটির অপ্রত্যাশিত সৌজন্যে তাহার বাবার মানসম্ভ্রম রক্ষা পাইয়াছে, ভদ্রাসন দায়গ্রস্ত হয় নাই, এ কৃতজ্ঞতায় তাহার নারী-হৃদয়টি ভরিয়া গিয়াছিল ; স্বামীর সম্বন্ধে কোনও বিরুদ্ধ ধারণাই সেখানে যেমন স্থান পাইত না, স্বামীর অপ্রিয় হইবার কোনও কারণই তাহার দিক্ দিয়া তেমনই উপস্থিত হইতে পারে নাই। স্বামীর সুদিনে বিনা প্রতিবাদে সে যেমন নিজের অনভিপ্রেত অনাবশ্যক ব্যয়বহুল বহু অনুষ্ঠানে হাত দিয়াছে, বর্ত্তমানের দুর্দ্দিনে স্বামীর অনভিপ্রেত জানিয়াও তাঁহার মান-সম্ভ্রম রক্ষা করিতে এক একখানি করিয়া গায়ের সমস্ত গহনা খুলিয়া দিয়া অপরিসীম তৃপ্তি অনুভব করিয়াছে।

নিরাভরণা পত্নীর দিকে চাহিয়া উপেন এক এক দিন দীর্ঘ-নিশ্বাস ফেলিয়া বলে,—তুমি যদি একটু কঠিন হতে, তা হলে হয়ত এতটা দুর্গতি তোমার হত না।

অভয়া হাসিয়া উত্তর দেয়,—গায়ে খানকতক গয়না থাকলেই সব দুর্গতি বুঝি আমার ঘুচে যেত ?

—জান না, ঐগুলোই যে আজকাল মেয়েদের মর্য্যাদার মাপকাঠি।

—আমি কিন্তু ভাগ্যের জোরে ওর গণ্ডী পেরিয়ে এসেছি।

—কিসে ?

—বুঝতে পারনি, সত্যি ?

—সুখের দিনে এমন নিবিড়ভাবে ত' তোমার সঙ্গে মেশবার অবসর পাইনি, এখন দুর্দ্দিনে সেটুকু পেয়ে তোমার কথায় অনেক তত্ত্বকথা শুনতে পাই। সত্যই আমি বুঝ্‌তে পারি নি।

—তুমি বুঝেছ, তবে ধরা দিচ্ছ না ;—আমি এই কথা বলতে চাইছি, আমার মর্য্যাদাব মাপকাঠি গয়না নয় মশাই,—তুমি।

—ঘরে যাব অন্ন নেই, "অদ্য ভক্ষ্যো ধনুর্গুণঃ" অবস্থা, এই নির্ধন স্বামী ?

—ধনই কি শুধু পুরুষের গুণের মাপকাঠি ? এই নির্ধন পুরুষের লেখা পড়ে সবাই যখন সুখ্যাতি করে, গয়না না পরার ক্ষোভটুকু তখন মনেই আসে না ; গয়না-পরা অনেক গরবিণীই আমাকে কত বড় ভাগ্যবতী মনে করে, তা ত জান না ! ছেলে-বেলায় ইস্কুলের ব'য়েও আমরা পড়েছি—নারীণাং ভূষণং পতিঃ। তবে ?

জীবনসংগ্রামে ক্ষতবিক্ষত দারিদ্র্যক্লিষ্ট সাহিত্যিক অভাবের ব্যথা ভুলিয়া নিরাভরণা মলিনবসনা পত্নীর প্রসন্ন মুখখানির দিকে শুদ্ধ বিস্ময়ে চাহিয়া থাকে, তাহার মুখে কথা ফুটে না।

এই দুঃখের সময় উপেনের বিধবা ভগিনী মায়া একমাত্র বালিকা কন্যার হাত ধরিয়া পিতৃপরিত্যক্ত অসহায় ভাইটির সংসারে আসিয়া উঠিল; সস্ত্রীক উপেন সাশ্রুনয়নে ভগিনীকে তাহাদের গৃহে আদর করিয়া বরণ করিয়া লইল, তাহাদের পুত্রকন্যারা পিসিমার কন্যা মমতাকে পাইয়া উল্লাসে আত্মহারা; দুঃখের সংসারে আর এক ভাগিদার আসিয়া জুটিল, এ দুর্ভাবনা কাহারও মনে দ্বিধা তুলিল না।

বিধবা হইবার পর শাশুড়ীর নিষ্ঠুর আচরণ সহ্য করিতে না পারিয়া সকন্যা মায়া প্রথমে পিত্রালয়েই আশ্রয় লইয়াছিল। পিতা তখন লোকান্তরিত, অন্যান্য ভ্রাতারা তাঁহার স্থলাভিষিক্ত হইয়া ধনে মানে বরেণ্য হইয়া উঠিয়াছিল। মায়া ও মমতাকে ভ্রাতারা আশ্রয় দিলেও, ভ্রাতৃজায়ারা সেটা পছন্দ করিতে পারে নাই। মন্দার বাজারে দুটি মানুষকে টানিয়া যাওয়া, তাহার পর আজ না হয় মমতা বালিকা, বছর কতক পরে তাহার বিবাহের বয়স হইবে, তখন?

উপেন নির্বোধ হইলেও, তাহার ভাইগুলি পিতার ধনসম্পত্তির সহিত তাঁহার তীক্ষ্ণবুদ্ধিটুকুরও উত্তরাধিকারী হইয়াছিল। তাহারা পরামর্শ করিয়া মায়াকে দিয়া তাহার শাশুড়ীর বিরুদ্ধে খোরপোষের একটা মাসোহারা আদায় করিতে মামলার পরিকল্পনা করিল। কিন্তু, মায়া বাঁকিয়া বসিল, সে দৃঢ়তার সহিত জানাইল, শাশুড়ী আমার সঙ্গে যে ব্যবহারই করুন, তিনি গুরুজন; তাঁর নামে আমি মামলা করতে পারব না।

ভগিনীর আচরণে ভায়েরা চটিয়া আগুন হইয়া উঠিল, ভ্রাতৃ-

জায়ারা শ্লেষ দিয়া অনেক কথাই শুনাইল। বড়ভাই ব্যঙ্গের সুরে মন্তব্য প্রকাশ করিল, উপেনের হাওয়া দেখছি তোর গায়েও লেগেছে, নিজের বুদ্ধিই বড় ; আমরা সব বোকা, আমাদের কথার কোন দাম নেই।

মায়া আর্ত্তস্বরে জিজ্ঞাসা করিল,—তোমাদের কি এমন সামর্থ্য নেই দাদা, আমার শাশুড়ীর পয়সা না নিয়ে আমাদের পুষতে পার ?

বড়ভাই বিরক্ত হইয়া উত্তর দিলেন,—থাকলেও পাওনাগণ্ডা কেন ছেড়ে দেবো ? নালিশ করলেই কম-পক্ষে পঁচিশটি টাকা মাসোহারা বরাদ্দ হবেই, এ আমরা ছাড়ব কেন ? নালিস কালই রুজ্ করব আমরা।

মায়া কঠিন হইয়া কহিল,—না খেয়ে আমরা শুকিয়ে মরব, সেও ভাল, তবু শাশুড়ীর নামে আমি তোমাদের নালিস করতে দেব না।

তখন ভায়েরা একমত হইয়া রায় প্রকাশ করিল,—তা হলে এ বাড়ীতে তোমার থাকা হবে না। উপেন কলকেতায় আছে, বই লিখে খুব নাম করেছে, তার কাছেই যাও।

সেই দিনই মায়া কন্যা মমতার হাত ধরিয়া কলিকাতায় উপেনের বাসায় আসিয়া উপস্থিত হয়। উপেন সমস্ত শুনিয়া গাঢ় স্বরে ভগিনীকে শুনাইয়া দিল,—আমি যদি তোমার অবস্থায় পড়তুম বোন, তা হলে আমিও ঠিক ঐ কথাই বলতুম। তোমার কথায় আমি ভারি আনন্দ পেয়েছি।

মায়া কহিল,—ছেলেবেলা থেকেই তোমার উঁচু মনটি যে আমি ভাল করেই জানি দাদা, তাই না তোমার কাছেই ছুটে এলুম।

উপেন জোরে একটি নিশ্বাস ফেলিয়া কহিল,—কিন্তু এমন দিনে

এলে বোন, মুখের মিষ্টি কথা ছাড়া তোমাদের আদর করবার আর কিছু আমার নেই।

মায়ার দুই চক্ষু তখন অশ্রুতে ভরিয়া গিয়াছে, আর্ত্তস্বরে সে কহিল,—মুখের আদরই যে সব চেয়ে বড় আদর দাদা, তোমার আয় নেই, অবস্থা সবই বুঝছি, তবু তুমি আমাকে এমন করে ঘরে তুলে নিলে; আর তারা—চাষের চাল, বাগানের ফসল, বাবার অতুল সম্পত্তি থাকতেও, আমাদের ঠাঁই দিলে না। কিন্তু, আর ত' এ অভাগীর কোথাও স্থান নেই, দাদা!

উপেন আকুল হইয়া কি বলিতে যাইতেছিল, কিন্তু অভয়া ছুটিয়া আসিয়া মায়ার হাতখানি ধরিয়া কহিল,—অমন কথা ব'ল না ঠাকুরঝি, এ সংসারে সবার আগে তোমার স্থান। আমাদের আটটি সন্তান, কিন্তু আমরা আজ থেকে জানব, তোমার মমতা তাদের সকলের ওপরে। তোমার ভাযের যেটুকু আয় আছে, যা উনি উপায় করে আনেন, তুমিই তা সকলকে বেঁটে দেবে, ঠাকুরঝি!

অশ্রুমুখী ভ্রাতা ও ভগিনী অভয়ার দৃপ্ত মুখখানির দিকে চাহিয়া রহিল, কাহারও মুখে কথা নাই, অবিরল অশ্রুধারায় বাক্‌-শক্তি তাহাদের রুদ্ধ হইয়া গিয়াছিল।

সে রামও নাই, সে অযোধ্যাও নাই। এই দুর্দ্দিনে প্রথম যৌবনের পরম পৃষ্ঠপোষক সমাজপতির কথা উপেনের স্মৃতিপথে প্রায় উদিত হইয়া উঠে, তখনকার সাহিত্যিক দিক্‌পালদের আন্ত-

রিকতার কত স্মৃতি ব্যথার অশ্রু সৃষ্টি করে। আজ তাঁহারা কোথায়? সাহিত্যের তপোবনে আজ বিপ্লবের ঝঞ্ঝা ছুটিয়াছে, যোগ্যতার আদর নাই, যোগাড় ও চাটুকারিতার সহায়তায় সুবিধাবাদীরা প্রতিভার গতি ফিরাইয়া দিয়াছে, স্তব্ধ বিস্ময়ে উপেন চৌধুরী তাহাদের দুর্ব্বার অভিযান দেখে, দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া সমাজপতিকে স্মরণ করে।

যে আপনভোলা মানুষটি নিজের সুসময় ও অসময়ে বহু দুঃস্থ সাহিত্যিকের সহায়তায় মুক্তহস্ত হইত, তাহার শোচনীয় দুর্দ্দিনে তাহাদের কেহই কোনও দিন সন্ধান লইতে আসে নাই,—ভাগ্য-বিড়ম্বিত তাহাদের সাহিত্যিক বন্ধুটির দিন কি ভাবে কাটিতেছে। কলিকাতা সহর, পাশের বাড়ীর অধিবাসী প্রতিবেশীর হাঁড়ীর খবর রাখে না; কে জানিবে—যে সংসারে দুই বেলায় একুশ বাইশ খানি পাতা পড়িবার কথা, সেখানে তাহাদের জীবনযাত্রা কি ভাবে নির্ব্বাহ হইতেছে!

উপেনের এখন কোনও বিলাস নাই, কোনও বিষয়ে উল্লাস নাই, দৈনিক কাগজে আমোদ-প্রমোদ বা খেলা-ধূলার খবরটুকু পড়িয়াই তাহার তৃপ্তি, যোগ দিবার প্রবৃত্তি কখনও দেখা যায় না; অহোরাত্র চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে চৌদ্দ ঘণ্টা সে লেখা লইয়া সাধনা করে। এই সাধনার মধ্যে সে বিশেষভাবে উপলব্ধি করিয়াছে অভাবের লাঞ্ছনা ও দুঃখের বেদনা। বহু চিত্রই উপেনের নিপুণ লেখনী চিত্রিত করিয়াছে, তাহার বহু গ্রন্থেই বীরত্ব, প্রণয়, সত্য-নিষ্ঠা ও সতীত্বের আদর্শ প্রতিফলিত হইয়াছে, কিন্তু আবাল্য অন্নকষ্টের সহিত অপরিচিত এই সাহিত্যিকের মস্তিষ্কে সত্যকার

দুঃখের অনুভূতি কোনও দিন আত্মপ্রকাশ করিতে পারে নাই। অভাব ও দুঃখের গতি এতদিনে তাহার লেখার গতিও ফিরাইয়া দিয়াছে। এখন তাহার রচনার প্রতিছত্রে এমন একটা করুণ ভাব ফুটিয়া উঠে, যাহা পড়িবামাত্রই মুখের উপর ক্লেশের চিহ্ন দেখা দেয়, চক্ষুপ্রান্তে অশ্রুর প্রবাহ বহিয়া যায়।

কয়েক দিন কঠোর পরিশ্রমের পর উপেন তাহার নূতন বড় গল্পটি সবেমাত্র শেষ করিয়াছে, গল্পের দুর্ভাগ্য নায়কের অপরিসীম দুর্গতি স্বহস্তের লেখনীতে দাগিয়া দিয়াও তাহার চক্ষু দুইটি তখনও অশ্রুর উদ্দাম আবর্ত্ত হইতে মুক্ত হইতে পারে নাই, এমন সময় ম্লানমুখে অভয়া তাহার লিখিবার টেবলখানির পাশটিতে আসিয়া দাঁড়াইল। পত্নীর মুখখানির উপর আর্ত্ত দুইটি চক্ষু পড়িতেই উপেন চমকিয়া উঠিল, সহস্র অভাবের মধ্যেও ত' সে অভয়াকে এমন ক্লিষ্ট হইতে দেখে নাই, তাহার চিরপ্রসন্ন সুন্দর মুখখানির উপর এরূপ বিষাদের ছায়া ত' কখনও পড়ে নাই; তাহার বুকখানি কাঁপিয়া উঠিল, ভীত কণ্ঠে প্রশ্ন করিল, কি হয়েছে?

অভয়া কাতরকণ্ঠে কহিল, তোমার লেখার সময় ব্যাঘাত দিতে কখনো আসি 'না, সংসারের সব ভাবনা থেকে তোমাকে আড়ালে রাখতে চাই, কিন্তু আর পারলুম না; অভাব না হয় সহা যায়, কিন্তু রোগকে ত' আর ঠেকিয়ে রাখতে পারছি না, তাই সব ভুলে তোমার কাছে ছুটে এসেছি—

—রোগ! কার—কার? কই কিছু ত' বল নি আমাকে!

—কি করে তোমাকে বলব? অষ্টপ্রহর মাথা খাটাচ্ছ তুমি,

আমাদের জন্যে দেহপাত করতে বসেছ তা ত' দেখছি, পেট ভরে খেতে পাও না, এর ওপর অসুখের কথা কি করে তোমাকে—

অভয়ার স্বর অশ্রুর আবেগে রুদ্ধ হইয়া গেল, উপেন বিচলিত কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল, কার অসুখ করেছে অভয়া ?

অভয়া অঞ্চলে দুই চক্ষু মুছিয়া কহিল, মমতার কথা বলতে এসেছিলুম। আজ চার দিন বাছা আমার একজ্বরি হয়ে পড়ে আছে, অমনি অমনি ছেড়ে যাবে ভেবে তোমাকে আমরা কিছু জানাই নি—

—ও ! তাই তাকে দেখতে পাই নি বটে, জিজ্ঞাসা করতে, বলেছিলে, ঘুমুচ্ছে। তোমরা আমাকে এরই মধ্যে এতটা তফাতে সরিয়ে দিয়েছ, পর করে ফেলছ ক্রমে ক্রমে—

—ওগো, না না—কেন তুমি একথা বলছ ! বোঝার ওপর বোঝার ভার তোমার ওপর কত চাপাব বল ! তিন দিন পরে সেরে যাবে ভেবে সব চেপে রেখেছিলুম ; আজ অবস্থা দেখে আর পারলুম না, ছুটে এলুম তোমাকে জানাতে। তোমার লেখায় বাধা দিলুম বুঝি, কিন্তু আর যে উপায় নেই !

—লেখা আমার শেষ হয়েছে, চল মমতাকে দেখি।

মমতার অবস্থা দেখিয়া উপেন শিহরিয়া উঠিল ; ফুলের মত সুন্দর মেয়েটি বিছানার সহিত মিশিয়া গিয়াছে ; এক এক বার চমকাইয়া উঠিতেছে, কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া জ্বরের ঝোঁকে ভুল বকিতেছে। কয়দিন কোনও চিকিৎসাই হয় নাই, মিছরির পয়সাও ঘরে নাই, ডাক্তার ডাকিয়া দেখাইবার ব্যবস্থা ত' দূরের কথা।

মায়ার মুখে কথা নাই, চুপটি করিয়া সে মেয়ের পাশে বসিয়া আছে; দাদার অবস্থা আসিয়া অবধি সে দেখিতেছে, সামান্য যাহা সে উপায় করিয়া আনে, সুশীলা ভ্রাতৃজায়ার সহিত পরামর্শ করিয়া তাহাতেই কি ভাবে যে দিনের পর দিন তাহারা এই জীর্ণ সংসারতরণীটি চালাইয়া আসিতেছে, অন্তর্যামী ভিন্ন অন্য কেহ তাহার সন্ধান রাখিতে পারে না। কিন্তু, ইহার উপর যদি ঝড় ওঠে, রোগ-ব্যাধি তুফান তোলে, কি করিয়া এ তরী তাহারা সামলাইবে!

সদ্যোসমাপ্ত লেখাটি পকেটে ফেলিয়া অস্নাত অভুক্ত অবস্থায় উপেন উপায় অন্বেষণে বাহির হইয়া পড়িল।

বছর কতক পূর্ব্বেও এই উপেন চৌধুরী বন্ধুমহলে জোর করিয়া বলিয়াছে—কর্ম্মক্ষেত্রে অসংখ্য দরজা খোলা পড়িয়া আছে; লেখাপড়া ভালরকম জানা থাকিলে কিংবা কোনও একটা বিষয়ে দক্ষতা থাকিলে জোর করিয়া সে যে কোনও দরজার ভিতর ঢুকিয়া কর্ম্ম আয়ত্ত করিতে পারে, বিফলমনোরথ কেন সে হইবে! কোনও শিক্ষিত ব্যক্তি বেকার হইয়া বসিয়া আছে শুনিলে, উপেন তাহার সম্বন্ধে দম্ভ করিয়া বলিত, হয় সে মাতাল, না হয় চরিত্রহীন, অথবা অলস! কৃতবিদ্য লোক ভাগ্যচক্রে কর্ম্মপন্থা হারাইয়া চরম দুর্দ্দশা ভোগ করিতেছে, উপন্যাসে বা গল্পে কোনও লেখক এরূপ চিত্র অঙ্কিত করিলে উপেন প্রতিবাদ তুলিয়া বলিত, ইহা অবাস্তব এবং অস্বাভাবিক।

কিন্তু, গত দুই বৎসরের কঠোর জীবনসংগ্রামে ক্ষতবিক্ষত ও পদে পদে আশাহত সেই উপেন চৌধুরী মর্ম্মে মর্ম্মে উপলব্ধি

করিয়াছে, কত বড় ভুল ধারণাই নিজের মনে বরাবরই সে পোষণ করিয়া আসিয়াছে এবং সেই সূত্রে তাহার পৃষ্ঠে অদৃষ্টের কি তীব্র কশাঘাত পড়িতেছে! এখন সে দুটি বেলা ঈশ্বরের উদ্দেশে অনুতাপের সুরে বলে, কর্ম্মফল অবশ্যম্ভাবী; তোমার ইচ্ছার তালে তালে পা ফেলিয়া মানুষকে চলিতে হইবেই।

চার

মধ্যাহ্নের প্রখর রৌদ্রের তেজটুকু সহ্য করিয়া উপেন চৌধুরী পর পর কতিপয় সাহিত্য প্রতিষ্ঠানের দ্বারস্থ হইল, কিন্তু অগ্রিম টাকা দিয়া কেহই তাহার লেখাটি লইল না। সকলেরই এক কথা, যে দিন-কাল পড়েছে, ছাপানো বইই বিক্রী হয় না, নূতন ছাপিয়ে করব কি! তবে কপিটা রেখে যদি যান, পরে বিবেচনা করে বলতে পারি।

কিন্তু, উপেনের যে কত বড় অভাব, তাহার সন্ধান কে রাখিবে! এ লেখা উপলক্ষ্য করিয়া যে অর্থ সে উপায় করিতে বাহির হইয়াছে, তাহার উপর নির্ভর করিতেছে অভাগিনী ভগিনীর একমাত্র সান্ত্বনার নিধি মমতার চিকিৎসা, ঔষধ, পথ্য—তাহার জীবন-মরণ-সমস্যা।

যে সকল প্রকাশকের সহিত উপেনের পরিচয় ছিল এবং যাহারা সাক্ষাৎসম্বন্ধে এখনও পর্য্যন্ত অপরিচিত, উপেন একে একে

তাহাদের সকলেরই সহিত সাক্ষাৎ করিল, যেখানে বিশেষ ঘনিষ্ঠতা ছিল, অভাবের হেতুটুকুও আভাসে জানাইল, কিন্তু কোথাও তাহার আশা মিটিল না।

এই সময় সহসা তাহার মনে পড়িল অপরাজিতা সাহিত্য-প্রতিষ্ঠানের কথা। সুপ্রতিষ্ঠিত বিরাট্ সাহিত্যভবন; বহু লব্ধপ্রতিষ্ঠ সাহিত্যিক এখানে মাথা মুড়াইয়াছেন, কিন্তু উপেন চৌধুরী কোনও দিন এই প্রতিষ্ঠানের সংস্পর্শে আসে নাই। উপেনের যখন সুসময়, অপরাজিতা সাহিত্য-প্রতিষ্ঠানের স্বত্বাধিকারী সত্যব্রত শর্ম্মা উপেনের রচিত একখানি গ্রন্থ ক্রয় করিতে চাহিয়াছিলেন। উপেনের তখন আকাঙ্ক্ষা, সে নিজের প্রতিষ্ঠানকে অপরাজিতার উপরে তুলিয়া তাহার নামের প্রভাবটুকু পর্য্যন্ত ম্লান করিয়া দিবে। সুতরাং সত্যব্রত শর্ম্মার প্রস্তাব সে দিন সে দম্ভভরে হাসিয়া উড়াইয়া দিয়াছিল। উপেনের ভাগ্যবিধাতাও সে সময় বোধ হয় মনে মনে হাসিয়াছিলেন।

বেলা তখন দুইটা, উপেনের অবস্থা ঠিক উন্মাদের মত। কোনও দিকে আর ভ্রূক্ষেপ না করিয়া সকল দ্বিধা মন হইতে ঠেলিয়া দিয়া সে অপরাজিতা আফিসে এই প্রথম প্রবেশ করিল। দেখিল, সত্যই বিরাট্‌ কার্য্যালয়, বহুজনে বৃহৎ ভবনের বিভিন্ন অংশ পূর্ণ। নিদারুণ অবসাদে ও উপর্য্যুপরি আশাভঙ্গে উপেনের দেহ তখন টলিতেছে, মাথার ভিতর ঝিম ঝিম করিতেছে। মনে এ অবস্থাতেও নানা সংশয়; নিজের অশিষ্টাচরণের কথা বার বার পীড়া দিতেছিল; কিন্তু তথাপি সে তাহার এইদিনের অভিযানের শেষ লক্ষ্যস্থানটুকু পরীক্ষা না করিয়া ফিরিবে না, এ বিষয়ে

একেবারে অটল। সুসময়ে সদ্ব্যবহার করিয়া যে সকল স্থানে অসময়ে কোন সহায়তা পায় নাই, যে স্থানে অসদ্ব্যবহার করিয়াছে, সেখানে কি প্রতিদান পায়, তাহা নির্ণয় করিতে বাধা কি!

অফিসের ভিতরে প্রবেশ করিতেই সেই কর্ম্মচারীর সহিত উপেনের প্রথম সাক্ষাৎ হইল—পাঁচ বৎসর পূর্ব্বে যে লোকটি এই প্রতিষ্ঠানের স্বত্বাধিকারীর পত্র লইয়া লেখার জন্য উপেন চৌধুরীর দ্বারস্থ হইয়াছিল। উপেনকে দেখিয়াই কর্ম্মচারীটি তাহার সম্মুখে আসিয়া সসম্ভ্রমে প্রশ্ন করিল,—এ কি, আপনি যে! কেমন আছেন চৌধুরী মশাই, চেহারা এ রকম কেন?

শুষ্ক কণ্ঠে উপেন কহিল,—রোদে অনেকটা পথ এসেছি কি না, তাই একটু ক্লান্ত হয়েছি;—আপনাদের কর্ত্তা কোথায়? আমি তাঁর কাছেই এসেছি।

কর্ম্মচারী উপেনকে সযত্নে কর্ত্তার সুসজ্জিত ঘরে লইয়া বসাইল, পাখা খুলিয়া দিল, তাহার পর সবিনয়ে জানাইল,—তিনি একটু আগেই বেরিয়েছেন, ফিরতে হয় তো ঘণ্টা দুই দেরী হবে। আপনি বসবেন কি?

উপেনের মুখে নৈরাশ্যের ছায়া পড়িল; বুঝিল, এখানেও কোন ভরসা নাই। ম্লান-মুখে কহিল,—আমি একটু জরুরী কাযেই এসেছিলুম, অতটা সময় অপেক্ষা করতে পারব না, তা হলে আজ উঠি।

কর্ম্মচারী কহিল,—আপনি আমাকে হয় তো চিনতে পারেন নি এখনও, কিন্তু আমি আপনাকে চিনি; আপনি মস্ত লেখক।

বোধ হয় আপনার মনে আছে, বছর পাঁচেক আগে কর্ত্তারই এক চিঠি নিয়ে আপনার কাছে একখানা বইয়ের জন্য গিয়েছিলুম।

উপেনের সর্ব্বাঙ্গ তৎক্ষণাৎ কণ্টকিত হইয়া উঠিল, অতি কষ্টে আত্মদমন করিয়া সে গাঢ়স্বরে কহিল,—দেখুন, এখানে ঢোকবার আগে সেই দিনটির কথা আমি বোধ হয় একশ বার মনে করিছি—তবুও এসেছি, সমস্ত সঙ্কোচ ত্যাগ করে।

কর্ম্মচারী কহিল,—তাতে কি হয়েছে? কর্ত্তা সে সব কথা মনেও রাখেন না, তা হলে এত বড় হতেন না তিনি। যা হউক, আপনার কি কাজ আমাকে যদি বলেন, কর্ত্তা এলেই আমি তাঁকে জানাতে পারি।

এতক্ষণে উপেন যেন অকূলে কূল পাইল, আগ্রহের স্বরে কহিল—দেখুন, ঈশ্বর যা করেন ভালর জন্যই; কর্ত্তা উপস্থিত থাকলে তাঁর কাছে চক্ষুলজ্জায় হয় তো আমি সব কথা বলতে পারতুম না। আমার যা বলবার, যে জন্য আমি এসেছি, আপনাকেই সব জানিয়ে যাচ্ছি, আপনি তাঁকে বললেই হবে।

তখন আবেগের স্বরে উপেন চৌধুরী তাহার সেদিনের নিষ্ফল চেষ্টা, নিজের আর্থিক দুর্দ্দশা ও বাড়ীর অবস্থা সংক্ষেপে বলিয়া তাহার নূতন-লেখা বইখানির পাণ্ডুলিপি সেই কর্ম্মচারীর হাতে সমর্পণ করিল।

কর্ম্মচারী কহিল,—কর্ত্তা আসবা-মাত্রই আমি তাঁকে এখানা দেব, আপনার কথা সব জানাব।

উপেন কহিল,—আমার ঠিকানা ওতেই লেখা আছে। তাঁকে বলবেন, যদি ওর মধ্যে বস্তু কিছু থাকে, তিনি যেন রাখেন, আর এই অসময়ে আমাকে দেখেন।

যে লেখাটি অবলম্বন করিয়া সারাদিন সে দ্বারে দ্বারে ঘুরিয়াছে, সেইটিই যেন ভারি বোঝার মত তাহাকে এতক্ষণ বিষম ব্যথা দিতেছিল। সেই বোঝাটা এই স্থানেই নামাইয়া দিয়া মাতালের মত টলিতে টলিতে সে বাহির হইয়া গেল।

রাস্তায় চলিতে চলিতে নিজের মনেই উপেন নিজের সমালোচনা করিতে লাগিল। কি সার্থকতা এই বৃত্তি অবলম্বনের! সে ত' নিজে কৃতবিদ্য, ভুঁইফোড় ওস্তাদ নহে; নিজের সাধনায় দেশের মধ্যে সে নাম করিতে পারিয়াছে, তাহার নাম আজ সকলেরই পরিচিত। কাগজকলম লইয়া অনায়াসেই সে এমন কোনও উপভোগ্য বিষয়-বস্তুর সৃষ্টি করিতে পারে, বিপুল বিদ্যার অধিকারী বহু মনীষীর পক্ষেই যাহা দুঃসাধ্য। অথচ, অর্থের দিক্ দিয়া তাহার কোনও সার্থকতাই নাই! তাহার মত এক নামী লেখক নিজের রচিত লেখা লইয়া দ্বারে দ্বারে ঘুরিয়াও তাহার বিনিময়ে সদ্য সদ্য গোটা-কতক টাকা উপায় করিতে পারিল না!

এবার তাহার মনে গৃহের স্মৃতি জাগিয়া উঠিল। কেমন করিয়া রিক্ত হস্তে সে বাড়ীর দরজায় মাথা গলাইবে? যদি মমতার অসুখ আরও বৃদ্ধির দিকে গিয়া থাকে,—কি ব্যবস্থা তাহার করিবে? সে ত' নিজেই রিক্ত, কিন্তু তথাপি সে বাড়ীর কর্ত্তা, অতগুলি প্রাণীর অভিভাবক!

না, টাকা তাহাকে সংগ্রহ করিতেই হইবে। হঠাৎ তাহার মনে পড়িয়া গেল, দুঃস্থ সাহিত্যিকদের দুর্দ্দিনে সে ত' কোনও দিন নিশ্চেষ্ট থাকে নাই। বহু দুঃস্থ সাহিত্যিকের কাহিনী সে শুনিয়াছে, সাগ্রহে সাধ্যের অতীত সাহায্যও করিয়াছে, কিন্তু

আজ তুলনায় সমালোচনা-সূত্রে তাহার মনে হইতেছে, দুর্দ্দশার দিক্ দিয়া সে নিজেই সকলকে অতিক্রম করিয়া ফেলিয়াছে।

দেওয়ালে দৃষ্টি পড়িতে সিনেমার এক অতিকায় প্লাকার্ডে কোনও নূতন চিত্রনাট্যের প্রযোজকের নামটি তাহাকে সহসা সচকিত করিয়া তুলিল। তিলোত্তমা চিত্রনাট্যের প্রসঙ্গে তাহার প্রযোজক, যে প্রভাত পাকড়াশীর নাম আজ প্রসিদ্ধ হইয়া উঠিয়াছে, এক সময় এই উপেনই ছিল তাহার পরম পৃষ্ঠপোষক। পাকড়াশীর তখন মাথা রাখিবার স্থান ছিল না, খাইবার কোনও সংস্থানই সে করিতে পারে নাই, সাহিত্যের তপোবনে তাহার কিছুমাত্র প্রতিষ্ঠা ছিল না, কবিগুরুর অনুকরণে কবিতা লিখিয়া সবে মাত্র ছাপাইতে সুরু করিয়াছে এবং সাহিত্যিকদের দলে ভিড়িয়া অদ্ভুত তৎপরতায় নিজের স্থানটুকু শুধু করিয়া লইয়াছে। উপেনের তখন ফলাও কারবার, পাকড়াশীর তোষামোদে ভুলিয়া তাহাকে স্থান দিল, স্থিতিরও ব্যবস্থা একটা হইল। সমবয়স্ক তরুণ সাহিত্যের পকেট হাতড়াইয়া যে লোকটিকে জীবিকার সংস্থান করিতে হইত, উপেন তাহার গতি ফিরাইয়া একটা উপায় করিয়া দিল। যতদিন উপেনের অদৃষ্ট-সাগরে জোয়ার চলিতেছিল, পাকড়াশী তাহার সংস্রব ছাড়ে নাই, কিন্তু ভাটার সূচনা দেখিয়াই সে গা ঢাকা দিয়াছিল।

আজ সেই পাকড়াশী কোনও বিষয়েই কৃতবিদ্য না হইয়াও সহরের শ্রেষ্ঠ ধনীর পরিচালিত এক বিশিষ্ট চিত্র-প্রতিষ্ঠানের পরিচালক ও প্রযোজক। উপেন পাকড়াশীর এই অপ্রত্যাশিত প্রতিষ্ঠার কথা শুনিয়াছিল, কিন্তু পাকড়াশী তাহার পুরাতন

পৃষ্ঠপোষক ও আশ্রয়দাতার সহিত আর কোনও সংস্রবই রাখে নাই। আজ উপেনের মনে হইল, এই অসময়ে যদি পাকড়াশীর সহিত দেখা করি, ক্ষতি কি। পারিশ্রমিক হিসাবে পাকড়াশীকে সে বহু পয়সাই দিয়াছে, দুঃস্থ সাহিত্যিক বলিয়া সাহায্যও অল্প করে নাই এবং কার্য্যসংস্রবে ঋণ বলিয়া সে যাহা দিয়াছে, তাহার একটি পয়সাও সে কোনও দিন উসুল করে নাই। ভাগ্যচক্রে পাকড়াশী আজ কত উপরে এবং উপেনের স্থান কত নিম্নে, তাহার মত দুঃস্থ আজ কে! সুতরাং সে যদি পাকড়াশীকে তাহার অবস্থার কথা বলে, তাহাতে কি দোষ!

আশার অদ্ভুত প্রভাব। অভুক্ত এই মৃতকল্প মানুষটির কানে লালসার মন্ত্র দিয়া আবার তাহাকে চৌরঙ্গীর সাহেবটোলায় টানিয়া লইয়া চলিল।

পাঁচ

অপূর্ব্ব চিত্রমন্দির, শোভা ও সৌন্দর্য্য যেন ঝলমল করিতেছে। দ্বিতলের এক মনোরম কক্ষদ্বারে উপস্থিত হইতেই জমকালো উর্দ্দীপরা বেয়ারা উপেনের সম্মুখে ছুটিয়া আসিল; জিজ্ঞাসা করিল, কি দরকার, কাকে চান?

প্রভাত পাকড়াশীর নাম করিতে বেয়ারা ছাপান এক টুকরা কাগজ ও পেন্সিল আনিয়া দিল, তাহাতে লেখা আছে, কি কায ও কাহাকে প্রয়োজন এবং নিম্নে সাক্ষাৎপ্রার্থীর নাম ও পরিচয়। উপেন কাগজখানিতে তাহার নাম ও প্রয়োজন লিখিয়া বেয়ারার

হাতে দিল। বেয়ারা সেখানি লইয়া কক্ষের দরজা ঠেলিয়া ভিতরে প্রবেশ করিল, ভিতরে তখন হাসির হর্‌রা ছুটিয়াছে, বাহির হইতেই তাহা স্পষ্ট শুনা যাইতেছিল।

ক্ষণকাল পরেই বেয়ারা ফিরিয়া আসিয়া জানাইল,—পাকড়াশী সাহেব এখন ভারি ব্যস্ত, দোসরা দিন আসবেন, দেখা হবে।

উপেন ভাবিয়াছিল, পাকড়াশী তাহার শ্লিপ পাইয়াই নিজে বাহিরে ছুটিয়া আসিবে তাহাকে অভ্যর্থনা করিতে। বেয়ারার মুখে তাহার উত্তর শুনিয়া সে যেন আকাশ হইতে পড়িল, তখনও তাহার ধারণা, হয় ত পাকড়াশী ঠিক বুঝিতে পারে নাই যে, সেইই—উপেন চৌধুরী!

সহসা কক্ষমধ্যে ক্রিং ক্রিং রবে ঘণ্টা বাজিয়া উঠিল, সঙ্গে সঙ্গে বেয়ারা পুনরায় ভিতরে ছুটিল এবং পরক্ষণে উচ্ছিষ্ট চায়ের পেয়ালা ও খাবারের ডিশ লইয়া বাহির হইয়া আসিল। উপেনের বুঝিতে বিলম্ব হইল না, কক্ষমধ্যে চা-পান ও জলযোগপর্ব্ব চলিয়াছিল। বেয়ারা শূন্য পাত্রগুলি লইয়া কক্ষান্তরে চলিয়া গেল। উপেন এই সময় সাহস করিয়া দরজা ঠেলিয়া ভিতরে প্রবেশ করিল।

পাকড়াশীর এখন চেহারা ফিরিয়াছে, পোষাকেরও পরিবর্ত্তন হইয়াছে। তথাপি পাকড়াশী সাহেবকে চিনিতে তাহার বিলম্ব হইল না। সাহেবী পরিচ্ছদধারী আরও তিন ব্যক্তি কক্ষমধ্যে বসিয়া ছিল। উপেনকে দেখিবামাত্রই পাকড়াশীর মুখে বিরক্তির চিহ্ন ফুটিয়া উঠিল, কিন্তু অভিনেতার মত সুকৌশলে সে ভাব গোপন করিয়া পাকড়াশী কহিল,—এই যে উপেনবাবু! কেমন আছেন?

উপেন কহিল,—তা হ'লে আমাকে চিনতে পেরেছ, পাকড়াশী?

চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া পাকড়াশী কহিল,—বিলক্ষণ! চলুন, বাইরে যাই, আমি এখন বেরুব কি না—

অগত্যা পাকড়াশীর সঙ্গে সঙ্গে উপেনকে বাহিরে আসিতে হইল, পাকড়াশী গম্ভীর-ভাবে কহিল,—একদণ্ড যদি ফুরসৎ পাই, এখনি ছুটতে হবে ষ্টুডিয়োতে, বসে যে আপনার সঙ্গে দু' পাঁচ মিনিট কথা কইব, তারও উপায় নেই। হাঁ, এখন কি করছেন? কারবারটা ত তুলেই দিলেন—

উপেন পাকড়াশীর ভঙ্গী দেখিয়া মনে মনে ভাবিতেছিল, সেই পাকড়াশী, অষ্টপ্রহর যে তাহার আফিসে পড়িয়া থাকিত, আজ তাহার এই পরিবর্ত্তন, কথা বলিবারও ফুরসৎ নাই। কোনও রূপ ভূমিকা না করিয়াই উপেন কহিল,—তোমার উন্নতিতে আমি খুব খুসী হয়েছি, পাকড়াশী, আমি কি করছি জিজ্ঞাসা করলে না? বসেই আছি। অবশ্য, কিছু কিছু লিখছি না যে তা ও নয়, কিন্তু তাতে চলছে না, ঠিক মত পয়সা পাচ্ছি না—

মুরুব্বীর চালে মাথা নাড়িয়া পাকড়াশী কহিল,—পয়সা কি লোকের কাছে আছে যে পাবেন, উপেনবাবু। কজন লোক এখন বই কিনে পড়ে বলুন না। ওর চেয়ে বরং একটা চাকরী-বাকরীর চেষ্টা দেখুন—

উপেন কহিল,—আচ্ছা, সে পরামর্শ তোমার সঙ্গে পরে করা যাবে, এখন ভারী একটা দায়ে পড়েই আমি তোমার কাছে এসেছি। সারা দিন ঘুরেও আজ কোথাও কিছুই পাই নি, অথচ বাড়ীতে ভাগিনাটি শুয়ছে, হাতে এমন কিছু নেই—

মুখখানি মচকাইয়া পাকড়াশী কহিল,—টাকার কথা বলছেন? আমার হাতে থাকলে আমি আনন্দের সঙ্গে আপনার এ বিপদে সাহায্য করতুম, কিন্তু নিজেই টাকার জন্য অস্থির হয়ে বেড়াচ্ছি। আটশ' টাকা এরা দেয়, কিন্তু একটি পয়সা জমাতে পারি না কোন মাসে, মটর একখানা কিনতে হয়েছে, তার ঠেলাতেই অস্থির! বাড়ীভাড়াই দিতে হয় মাসে দেড়শ'। বলেন কেন, শান্তি কিছুতেই নেই। আচ্ছা, এখন নমস্কার, আর একদিন আসবেন, সব শুনব—

শেষের কথা কয়টি বলিতে বলিতেই পাকড়াশী সিঁড়ির দিকে ক্ষিপ্রপদে ছুটিল। উপেন ক্ষণকাল নির্ব্বাক্ বিস্ময়ে এই অদ্ভুত জীবটির দিকে চাহিয়া রহিল।

ছয়

রিক্তহস্তে যে লোক মধ্যাহ্নে বাড়ী হইতে বাহির হইয়াছিল, সায়াহ্নে সেই লোক দুশ্চিন্তা ও অবসাদের এক গুরুভার বোঝা মাথায় লইয়া বাড়ীর সান্নিধ্যে বিস্ময়াতঙ্কে দাঁড়াইল। উপেন দেখিল, তাহার বাড়ীর দরজার সম্মুখে একখানি সুদৃশ্য মটর দাঁড়াইয়া আছে। অমনই বুকের ভিতরটা তাহার ছাঁত করিয়া উঠিল। তবে কি মমতার অসুখ বাড়াবাড়ি হইয়াছে, পাড়ার কেহ কি হাসপাতালে খবর দিয়াছে, সেখান হইতেই কি —

কল্পনার আর উপসংহার হইল না, উপেন কোনও রূপে শিথিল দেহটাকে টানিয়া যেন জোর করিয়াই বাড়ীর দরজার সম্মুখে—

গাড়ীখানির পার্শ্বে গিয়া দাঁড়াইল। উদ্দেশ্য, সোফারকে জিজ্ঞাসা করিবে, কাহার গাড়ী, কেন আসিয়াছে।

কিন্তু, গাড়ীর ভিতরে দৃষ্টি পড়িতেই সে সবিস্ময়ে দেখিল, অপরাজিতা আফিসের সেই কর্ম্মচারীটি সেখানে বসিয়া রহিয়াছে। উপেনকে দেখিয়াই কর্ম্মচারী ব্যগ্র উল্লাসে কহিয়া উঠিল, এই যে চৌধুরী মশাই, এসেছেন আপনি! এতক্ষণে নিশ্চিন্ত হলুম, এত দেরী কেন হল, বলুন ত? আপনার বাড়ীতে সবাই ভেবে অস্থির, যান যান—আগে বাড়ীতে গিয়ে দেখা দিয়ে আসুন।

উপেন একেবারে অবাক্, অপরাজিতা আফিসের কর্ম্মচারী তাহার বাড়ীর সম্মুখে, তাহার বাড়ীর সংবাদ রাখে, ব্যাপার কি! রুদ্ধকণ্ঠে প্রশ্ন করিল, আমি যে কিছু বুঝতে পারছি না, আপনি এখানে? কি ব্যাপার বলুন তো! আমি যে—

কর্ম্মচারী ততক্ষণ গাড়ী হইতে নীচে নামিয়াছেন, উপেনের ভাবভঙ্গী দেখিয়া হাসিমুখে কহিলেন,—আপনি লেখাটা রেখে চলে আসবার মিনিট কুড়ি পরেই কর্ত্তা ফিরে আসেন। আমি তাঁকে তখনই সে লেখা দিই, আপনি এসেছিলেন কি রকম দায়ে পড়ে, তাও তাঁকে জানাই। কর্ত্তা চেয়ারে বসেই আপনার লেখা পড়তে আরম্ভ করলেন দেখে আমি আমার কাযে যাই। ঘণ্টা-খানেক পরেই আমার ডাক পড়ল কর্ত্তার ঘরে; সেখানে ঢুকেই দেখলুম, তিনি রুমালে চোখ মুছছেন, সামনেই আপনার লেখাগুলো তখনও খোলা রয়েছে। বুঝলাম, আপনার লেখা তাঁকে কাঁদিয়ে দিয়েছে। আমাকে দেখেই বললেন, আমার মোটর নিয়ে তুমি এখনি বেরিয়ে পড়, আমাদের ডাক্তারবাবুকে নিয়ে যাও, চিকিৎসার যেন

কোনও ত্রুটি না হয়। তাই আসতে হয়েছে। ডাক্তার বাবু বাড়ীর ভিতরেই আছেন, ওষুধের ব্যবস্থা করেছেন, ভয় নেই বল্লেন, সেরে যাবে, আপনি কিছু ভাববেন না, আপনার ভাগ্নীর জন্য—ডাক্তার বোস যখন ভার নিয়েছেন তার চিকিৎসার।

উপেন মন্ত্রমুগ্ধের মত কথাগুলি শুনিতেছিল, তাহার মনে হইতেছিল, দুইখানি পায়ের তলদেশ হইতে রাস্তাটা যেন নীচে সরিয়া যাইতেছে। যাহা স্বপ্নাতীত, কল্পনার অতীত, তাহা আজ বাস্তবে পরিণত! অপরাজিতার ধনকুবের স্বত্বাধিকারী তাহার ধৃষ্টতা উপেক্ষা করিয়া অসময়ে এমন অযাচিত সহায়তায় ব্রতী হইয়াছেন!

এই সময় সেই কর্ম্মচারী বিস্ময়চমৎকৃত উপেনের হাতে নোটের একটি ক্ষুদ্র তাড়া গুঁজিয়া দিয়া কহিল,—কর্ত্তা আমার হাত দিয়ে উপস্থিত একশ' টাকা আপনাকে পাঠিয়েছেন, আর বলে দিয়েছেন, আপনি কাল বিকেলের দিকে তাঁর সঙ্গে একবার দেখা করবেন, বইখানার দরদস্তুর ও আর আর কথাবার্ত্তা সব স্থির হবে।

উপেন চৌধুরী অবাক্ হইয়া তাহার সম্মুখে দণ্ডায়মান সেই বর্ষীয়ান্ দেবদূতটির দিকে চাহিয়া রহিল. অপরিসীম আনন্দে তখন তাহার কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া গিয়াছে।

উৎসাহের সুরে কর্ম্মচারী পুনরায় জানাইয়া দিল,—দুঃখের পাঁচালী লিখে দুঃখকে আপনি এবার জয় করেছেন চৌধুরী মশাই, এবার আপনার সুখের পালা!

দুঃখের পাঁচালী

চিত্র-শিল্পীর

এক

আশ্বিন মাসের গোড়ায় পাওনাদারদের কিছু কিছু দিয়া সুকুমার সকলকেই একবাক্যে বলিয়া দিল,—ষষ্ঠীর দিন সন্ধ্যায় হিসেব আপনাদের শোধ করে দেব, এর ভেতরে আমাকে আর তাগাদা করবেন না।

সুকুমারের এই প্রতিশ্রুতির মূল্য যে কতটুকু, তাহা তাহার পাওনাদারদের অবিদিত ছিল না। কিন্তু খোস-খবর ঝুঠা হইলেও তাহা অন্ততঃ শ্রুতিসুখকর হইয়া থাকে,—দেনদার টাকা দিবার একটা দিন যদি নির্দেশ করিয়া দেয়, পাওনাদার তাহাতেই কতকটা আশ্বস্ত হইয়া যায়।—সুতরাং, বৎসরের শুভদিনটিতে যেন কথার খেলাপ না হয়—এই সতর্ক ইঙ্গিতটুকু করিয়া একে একে পাওনাদারের দল সুকুমারকে উপস্থিত রেহাই দিয়া গেল। সুকুমারও যেন চক্রব্যূহ ভেদ করিয়া বাহিরের ছোট ঘরখানির ভিতর ঢুকিয়া তুলি-প্যালেট লইয়া বসিল।

সুকুমার শিল্পী। বয়স আটত্রিশ বৎসর। দিব্যকান্তি, সুপুরুষ; কিন্তু সম্প্রতি অভাবের সহিত কঠোর সংগ্রামের ফলে এই বয়সেই চুলে তাহার পাক ধরিয়াছে, মুখে বার্দ্ধক্যের ছায়া পড়িয়াছে। অথচ না আছে তাহার কোনও বিলাস, কিম্বা না করিয়াছে এমন কোনও নিষিদ্ধ বিষয়ে প্রয়াস—যাহাতে রুচি-

বাগীশদের চিত্তে কিছুমাত্র শিহরণ উঠিতে পারে। অভাব মোচনে অক্ষমতা ভিন্ন তাহার সম্বন্ধে অন্য কোনও ক্রুটি বা অপরাধ তাহার শক্ররাও এ পর্য্যন্ত নির্ণয় করিয়া উঠিতে পারে নাই।

অর্থের দিক দিয়া যাচাই না করিয়া সুকুমারের সম্বন্ধে এইটুকু নির্ব্বিচারেই বলা চলে যে, সত্যকার স্বভাব-শিল্পী সে। পিতার আর কোনও মূলধন সে পায় নাই। পাইয়াছিল শুধু উত্তরাধিকার-সূত্রে এই অনবদ্য ও অপরাজেয় শিল্প-প্রতিভা। সুকুমারের পিতাও ছিলেন সুদক্ষ শিল্পী। তবে তিনি স্বাধীনভাবে শিল্পকে অবলম্বন করিয়া ভাগ্য পরীক্ষায় কর্ম্মক্ষেত্রে নামেন নাই,—আর্ট-স্কুলে চাকরী লইয়া সারাজীবন তাহাতেই কাটাইয়া গিয়াছেন। শিল্পের দিকে সুকুমারের সহজাতপটুতা তাঁহাকে মুগ্ধ করিয়া তুলিলেও, এই বিভাগে আর্থিক উন্নতি সুদূরপরাহত জানিয়াই তিনি পুত্রকে উচ্চ শিক্ষার পথে জোর করিয়া ঠেলিয়া দিয়াছিলেন। আবার কি ভাবিয়া তিনিই একদিন তাহাকে কলেজের দ্বিতীয় বার্ষিক শ্রেণী হইতে টানিয়া আনিয়া আর্ট স্কুলের ছবির ঘরে ঢুকাইয়া দিলেন এবং ইহার কয়েকমাস পরেই একখানি জীবন্ত ছবির সংযোগে পুত্রের শিল্প-সাধনা সার্থক করিয়া তুলিলেন।

ছয়টি বৎসর পরে ছাব্বিশ বৎসরের সার্ভিসের মায়া কাটাইয়া সুকুমারের পিতা যখন উপরওয়ালার সঙ্গীন আহ্বানে সেখানে এত্তেলা দিতে চলিয়া গেলেন, শুভানুধ্যায়ী আত্মীয়স্বজন সে সময় বিস্ফারিত নেত্রে হিসাব করিয়া দেখিলেন, ঘরের পয়সা খরচ করিয়া বেকুব বৃদ্ধ একমাত্র পুত্রটিকে পেনসিল লইয়া কাগজে কিম্বা রঙ্ গুলিয়া তুলির সাহায্যে ক্যাম্বিসে হিজিবিজি কাটিয়া ছেলেখেলা

মাত্র শিখাইয়া গিয়াছে। যে লোক ছাব্বিশ বৎসর নকরী করিয়াছে, তাহার ক্যাস বাক্সে ছাব্বিশটি টাকাও সঞ্চিত নাই! মেয়ের বিবাহের দেনা, দোকানদারদের পাওনা, ভবিষ্যতের ভাবনা ও সকলের উপর শ্রাদ্ধের দায় যেন একসঙ্গে তালগোল পাকাইয়া বিভীষিকা দেখাইতেছে। ছেলেখেলার বিদ্যা শিক্ষা দিয়া বিদ্যালয়ের কর্ত্তারা সুকুমারকে একখানি লম্বা-চওড়া ডিপ্লোমার কাগজ দিয়া বলিয়াছিলেন নাকি এমন কাগজ এ পর্য্যন্ত কোন ছেলেই তাঁহাদের স্কুলে পায় নাই;—কিন্তু হিসাবী আত্মীয় স্বজন সে সম্বন্ধে উপহাসের সুরে বলিলেন, ছেলে মানুষকে এই বলেই বুঝিয়ে জল করে দিলে; এখন এ কাগজ নিয়ে ধুয়ে খাক! শত্তুরদের মুখে ছাই দিয়ে এই বয়সে তিন ছেলের বাপ; গলায় বিধবা মা, আইবুড়ো বোন;—চলবে কিসে?

কিন্তু সুকুমার যখন এ সকল আলোচনায় কান না দিয়া পিতার পারলৌকিক কাজ শেষ করিয়া শুদ্ধ হইল, শুভানুধ্যায়ী হিতৈষীরা শ্রাদ্ধের ভোজ খাইয়াই নিরুত্তরে চলিয়া গেলেন। সুকুমারের সংসার কি করিয়া চলিবে, সে সম্বন্ধে কাহাকেও আর আলোচনা করিতে দেখা গেল না। স্কুলের কর্ত্তৃপক্ষগণ স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া যে অর্থ সাহায্য করিয়াছিলেন, তাহাতেই সুকুমার পিতার কায শেষ করিতে পারিয়াছিল।

শ্রাদ্ধ-শান্তির পর স্কুলের কর্ত্তৃপক্ষগণের পীড়াপীড়িতে সুকুমারকে স্কুলের কার্য্য গ্রহণ করিতে হইল এবং একটানা আট বৎসর স্কুলের সেবা করিয়া গত তিন বৎসর হইতে স্বাধীনভাবে ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হইয়াছে। ইতিমধ্যে সে পিতার সমস্ত দেনা পরিশোধ করিয়াছে,

মাতার মৃত্যুর পর তাঁহার শ্রাদ্ধাদি যথাসম্ভব সমারোহে সম্পন্ন করিয়াছে, ভগিনীর বিবাহ দিয়াছে এবং সংসারটি বেশ স্বচ্ছলভাবেই চালাইয়া আসিয়াছে। ছেলে-খেলার বিদ্যা শিখিয়া সুকুমারকে এমন ভাবে সংসার ধর্ম্ম পালন করিতে দেখিয়া আত্মীয় স্বজনের বিস্ময়ের অন্ত নাই। তখন একবাক্যে মন্তব্য প্রচারিত হইল,—বউটি পয়মন্ত, ওর আয়পয়েই ছোঁড়াটা এ যাত্রা তরে গেল!

কিন্তু চিরদিন কাহারও সমান যায় না। সুকুমারের সুখময় সংসারের শুভ্র আকাশখানি কালো করিয়া দুর্দ্দিনের মেঘ ঘনীভূত হইল। একটি বিদেশীয় চিত্র-প্রতিষ্ঠানের ডিজাইন সংক্রান্ত কায-কর্ম্ম সুকুমার চুক্তিবদ্ধ হইয়া সম্পন্ন করিত। ইহাই ছিল তাহার প্রধান উপজীবিকা। এই কাজের পর অবসর মত সে নানাবিধ চিত্র অঙ্কন করিয়া সহরের দুই একটি নামকরা দেশীয় চিত্রালয়ের সহিতও যোগসূত্র রচনা করিয়াছিল। সাধনার মত সে শেষের কাজগুলিতে আত্মনিয়োগ করিয়া একটা অপরিসীম তৃপ্তি অনুভব করিত, অর্থের মুখ চাহিয়া সে কার্য্যে প্রবৃত্ত হইত না। যে যাহা ইচ্ছা করিয়া দিত, সুকুমার বিনা প্রতিবাদে তাহাই লইত, কোনও প্রতিবাদ কোনদিন তাহার পক্ষ হইতে উঠে নাই।

সহসা সুকুমার প্রবল জ্বরে আক্রান্ত হইল, সে জ্বর শেষে টাইফয়েডে দাঁড়াইল। সহধর্ম্মিণী ছবির প্রাণপণ সেবায় ও সর্ব্বস্বপণে তুমুল চিকিৎসায় সুকুমার সে যাত্রা প্রাণ পাইল, কিন্তু বিদেশীয় প্রতিষ্ঠানের সহিত চুক্তিবদ্ধ কাযগুলি যথাসময়ে সম্পন্ন করিয়া দিতে না পারায় তাহাদের সহিত সংস্রব হারাইতে হইল। শুধু তাহাই নহে, সুকুমারের কোনও সাড়াশব্দ না পাইয়া কোম্পানী

চুক্তিভঙ্গের জন্য খেসারতের দাবীতে মামলা রুজু করিলেন। সুকুমার চিরদিন নির্ব্বিরোধ, মামলা-বাজীর দিক দিয়া না গিয়া তাহার এক শিল্পী বন্ধুকে মধ্যস্থ পাঠাইয়া আপোষে হাঙ্গামা মিটাইয়া ফেলিল। কিন্তু এই ঝঞ্ঝাটটুকু কাটাইতে স্ত্রীর গায়ের গহনাগুলি সমস্ত বাঁধা পড়িল। কঠিন রোগের পর যেখানে বিশ্রাম একান্ত প্রয়োজন, সেখানে চলিল জীবিকার জন্য কঠোর পরিশ্রম। যে কাজটুকু ছিল তাহার নিশ্চিত অবলম্বন, তাহা হস্তচ্যুত ; ঘরে যাহা কিছু সঞ্চিত ছিল, সমস্তই নিঃশেষিত ; স্বচ্ছল সংসারে অভাব ও নিরাশার গাঢ় অন্ধকার! নির্দ্দিষ্ট আয় নাই, ইচ্ছাসত্বেও পরিশ্রমের সামর্থ্য নাই, কিন্তু সংসারের সমস্ত খরচপত্র যথাযথই আছে, দেনার উপর দেনা চলিয়াছে। যে লোককে জিনিস দিবার জন্য দোকানদারদের প্রচুর আগ্রহ দেখা যাইত, এখন তাহাদের অন্য মূর্ত্তি ; টাকা পড়িয়া থাকিলেও যাহারা দৃক্‌পাত করিত না, এখন দুটিবেলা তাহারা সুকুমারের বাড়ীর সম্মুখের রাস্তা পর্য্যন্ত চষিয়া ফেলে। একটি বৎসরের মধ্যেই এই পরিবর্ত্তন!

ইতিমধ্যে একটু সুস্থ হইয়া সুকুমার বিখ্যাত বাঙ্গালী চিত্র-প্রতিষ্ঠান শ্রীদুর্গা চিত্রালয়ের মালিকের সহিত সাক্ষাৎ করিল। এক সময় এই প্রতিষ্ঠানে সুকুমারের খ্যাতি ও খাতিরের অন্ত ছিল না। মালিক অবিনাশ আতর্থী ঝানু ব্যবসায়ী। ব্যবসায়ের সূচনায় পায়ে হাঁটিয়া মাল গস্ত করিতেন, ব্যবসায় একটু জাঁকিলে ট্রামে চাপা সুরু করেন ; এখন পড়তা তাঁহার দুর্ব্বার। দ্বারে সর্ব্বক্ষণ ঘরের মোটর দাঁড়াইয়া থাকে। সুকুমারের প্রতিভা বহু পূর্ব্বেই আতর্থীর চিত্রালয়ে প্রভাব বিকাশ করিয়াছিল। তাহার

বর্ত্তমান দুরবস্থার কথাও তাঁহার কর্ণগোচর হইয়াছিল। সুকুমার অবিনাশ আতর্থীর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া কাযের কথা পাড়িতে তিনি এমন ভঙ্গীতে কতকগুলি ছবির ডিজাইন করিতে দিলেন, যেন সেগুলির কোনও গুরুত্বই নাই, শুধু বিপন্ন সুকুমারকে এ সময় কিঞ্চিৎ সহায়তা করিবার জন্যই এই অপ্রয়োজনীয় ভার তাহার উপর চাপাইতেছেন। কিন্তু আতর্থীর আফিসের অনেকেই জানিত, একখানি মহার্ঘ্য ছবির অ্যালবাম সম্পর্কে এই ডিজাইন-গুলির আবশ্যকতা কত গুরুতর। সুকুমার কুণ্ঠিতভাবে কিছু অগ্রিম প্রার্থনা করিলে আতর্থী কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিলেন, তাহাব পর কি ভাবিয়া পঁচিশটি টাকা সুকুমারের হাতে দিয়া কহিলেন, তা'হলে সব কাজ ফেলে এগুলি আগে সেবে ফেলুন। কাজ শেষ হলে এর পর টাকা পাবেন।

এই অগ্রিম প্রাপ্ত টাকাগুলিই পাওনাদারদের ভাগ করিয়া দিয়া সুকুমার তাহাদের অনুরোধ জানাইল,—পূজার ষষ্ঠীর দিন বাকী হিসেব সব শোধ করে দেব, এর মধ্যে আর তাগাদা করবেন না।

দুই

সুকুমার সবে ছবির কাজে হাত দিয়াছে, এমন সময় ভিতরের দিকের দরজা ঠেলিয়া সহধর্ম্মিণী জীবন্ত ছবি সে ঘরে প্রবেশ করিল। সুকুমার সাড়া পাইযা দুই চক্ষু তুলিয়া চাহিল মাত্র, কিছুই বলিল না। ছবি কহিল,—বেশ লোক ত তুমি !

সুকুমার কহিল,—কেন, কি করেছি শুনি?

ছবি কহিল,—সবাইকে জলের মত বুঝিয়ে দিলে, পূজোর ষষ্ঠীর দিন হিসেব ওদের মিটিয়ে দেবে। ব্যাঙ্কে এখনো কিছু লুকানো আছে বুঝি?

সুকুমার ডিজাইনের কাগজ ও তুলিটি তুলিয়া কহিল,—আমার ব্যাঙ্কের টাকা এইখানে জমা আছে। একটি মাস যদি আমি নিশ্চিন্ত হয়ে কাজ করতে পাই, কেউ তাগাদা না করে, তুমি কোনও অভাব না জানাও, তাহলে মুখে যা বলেছি, কাজেও তাই ঠিক করবো।

ছবি মুখখানি মলিন করিয়া কহিল,—আমি সব বুঝি, কিন্তু অভাব তোমাকে না জানিয়ে আর কাকে জানাব বল! যতক্ষণ হাতে কিছু ছিল, কোনও উপায় ছিল, তোমাকে ত বলিনি কিছু। কিন্তু এখন? যে টাকা কটি পেলে, সবই ওদের হাতে তুলে দিলে, সমস্ত টাকা না পেলে ওরা ত জিনিস দেবে না, এখন সংসার আমি চালাই কি করে?

সুকুমার স্বর কঠিন করিয়া উত্তর দিল,—তোমার চালাবার দরকার নেই, অচল হয়েই থাক্।

গাঢ় স্বরে ছবি কহিল,—বেশ!

পরক্ষণেই বিষাদ প্রতিমার মত সে ভিতরে চলিয়া গেল। এক বৎসর পূর্ব্বে কি নির্ম্মল শান্তিই সুপ্রতিষ্ঠিত ছিল এই সংসারে, কিন্তু অভাব এক্ষণে আত্মপ্রকাশ করিয়া ধীরে ধীরে শান্তির সে সুষমা ম্লান করিয়া দিতেছে।

সুকুমার হাতের কাজ লইয়া তাহাতেই ডুবিয়া পড়িল। স্বামীর

পরিষ্কার জবাব শুনিয়াও ছবি সংসারের হাল ছাড়িতে পারিল না। একটু পরেই আটখানি পাতা পড়িবে, তাহার ব্যবস্থা না করিয়া সে অভিমান করিবে কাহার উপর? এখনি যে ছেলেরা ক্ষুধার তাড়নায় তাহাকে পাগল করিয়া তুলিবে! বাক্সের মধ্যে লুকানো যে স্বর্ণখণ্ডটুকু ছিল, ছেলেদের সহায়তায় তাহা বিক্রয় করিয়া কয়দিনের মত অন্ন সংস্থান করিয়া লইল।

যথাসময় বাহিরে সুকুমারের উপর স্নানের তাগিদ গেল। স্নানান্তে বক্রদৃষ্টিতে সে দেখিল, দালানে ভোজনের আসন পড়িয়াছে, ছেলেরা তাহার প্রতীক্ষা করিতেছে; ছোটটি অধৈর্য্য হইয়া আধ আধ স্বরে ডাকিতেছে—'বাব্বা ভা খাবি আয।'—শিশুর এই ব্যগ্রতার কারণ, বাবার কোলে বসিয়া এক পাত্রেই উভয়ের ভোজনপর্ব্ব চলে।

সুকুমার নিরুত্তরেই ভোজন করিল, ভোজনান্তে বিশ্রাম না করিয়াই হাতের কাজ লইয়া বসিল।

সাতটি দিন এই ভাবে কাটিল। বাড়ীর কাহারও সহিত সুকুমারের যেন কোন সম্বন্ধই নাই; বাহিরের ঘরের অসম্পূর্ণ কাজগুলির সহিত সে যেন সহস্র বন্ধনে বিজড়িত। ভিতর হইতে সাড়া পাইলে স্নান সারে, খোকার আহ্বানে ভোজন করিতে আসনে গিয়া বসে; ভোজনের পর আবার বাহিরের ঘরে ফিরিয়া কাজে মগ্ন হইয়া যায়।

অষ্টম দিনে ভিতর হইতে স্নানের জন্য তাগিদ পাওয়া গেল না। কয়েকখানি ডিজাইনের কাজ শেষ হওয়ায় সুকুমারের চিত্তটি আজ অনেকটা প্রসন্ন। কিন্তু পৌরুষের অভিমান তখনও সম্পূর্ণ কাটে

নাই ; স্নানের জন্য মন উসখুস করিতেছে, কিন্তু আহ্বান না আসিলে কি করিয়া যায় ! যদি পত্নী তাহার এ দুর্ব্বলতাটুকু লক্ষ্য করিয়া কোনও নীরব অশনি নিক্ষেপ করে !

এই চিন্তাজাল সহসা ছিন্ন হইয়া গেল ক্ষুধার্ত্ত শিশুর মর্ম্মন্তুদ রোদনে ! সাত বছরের ছেলেটি তখন আর্ত্তরোল তুলিয়া বলিল, আর যে থাকতে পারছি না মা—ক্ষিদেয় পেট জ্বলে গেল !

কোলের শিশুটি সঙ্গে সঙ্গে আধ আধ স্বরে সুর করিয়া উচ্ছ্বাস তুলিয়াছিল,—বাব্বা ! ভা নেই—ভা নেই।

সুকুমারের বুকের ভিতর কে যেন হাতুড়ির ঘা দিল। সমস্ত সঙ্কোচ কাটাইয়া সে ডাকিল—উষা।

একটু পরেই দ্বার ঠেলিয়া নয় বৎসরের কন্যা উষা ম্লানমুখে আসিয়া দাঁড়াইল। সুকুমার লক্ষ্য করিল, মুখখানি তাহার শুকাইয়া গিয়াছে, অশ্রু যেন পল্লবপ্রান্তে উদগ্র হইয়া উঠিয়াছে, কন্যার সেই মলিন মুখখানির দিকে চাহিয়া সুকুমার প্রশ্ন করিল,—হাঁরে আজ যে বড় আমাকে নাইতে ডাকলি নি ?

উষা মৃদুকণ্ঠে উত্তর দিল,—নেয়ে উঠেই যে খেতে বসা তোমার অভ্যেস, বাবা।

পিতার পুনরায় সবিস্ময় প্রশ্ন,—তাতে হয়েছে কি ?

আর্দ্রকণ্ঠে উষা কহিল,—আজ যে আমাদের রান্না চড়েনি, বাবা !

—রান্না হয়নি ?

—সব বাড়ন্ত, ঘরে কিছু নেই। দাদারা না খেয়েই স্কুলে গেছে। নিমি ক্ষিধের জ্বালায় চেঁচিয়ে বাড়ী মাথায় করছে ; মা

বসে বসে কাঁদছে। কি হবে বাবা!—বালিকার শেষের কথাগুলি অশ্রুর আবর্ত্তে উচ্ছ্বসিয়া উঠিল।

সুকুমার সবেগে উঠিয়া দাঁড়াইল। কন্যার দৃষ্টি পিতার দিকে। সেই করুণ দৃষ্টি সুকুমারের পৃষ্ঠে যেন বেত্রাঘাত করিল। সে আশ্বাসের সুরে কহিল,—শিগগীর উনুনে আগুন দিতে বল্, আমি এখনি আসছি।

কন্যা আর্ত্তকণ্ঠে জানাইল,—কয়লাও যে বাড়ন্ত, বাবা!

উন্মত্তের ন্যায় মুখখানি বিকৃত করিয়া সুকুমার কহিল,—বাঃ! বাঃ! খাসা! ওঃ! বেশ!

কন্যা পিতার দিকে চাহিয়াই ছিল, শিহরিয়া উঠিল। সুকুমার পরক্ষণেই কি ভাবিয়া কহিল,—বাড়ীর ভেতর যা মা, আমি বেরুচ্ছি এখুনি, ফিরতে দেরী হবে না।

কন্যা পিতার দিকে চাহিয়া দরজাটি টানিয়া দিয়া চলিয়া গেল। সুকুমার ঘরের চারিদিকে চাহিয়া দেখিল, বিক্রয় করিয়া আজিকার ক্ষুন্নিবৃত্তি করিবার মত কিছুই নাই। সহসা তাহার বুভুক্ষু দৃষ্টি পড়িল, বাহুমূলে রক্ষিত স্বর্ণময় আধারে আবৃত মহামৃত্যুঞ্জয় কবচটির উপর। অসুখের সময় ছবির চেষ্টায় শান্তি-স্বস্ত্যয়নের সহিত এই অমোঘ কবচটি প্রস্তুত হইয়া তাহার বাহুমূল আশ্রয় করে। স্বর্ণাধার সহ কবচটি যে স্বর্ণশৃঙ্খলে আবদ্ধ ছিল, অভাবের অনলে পূর্ব্বে সেটি ইন্ধন হইয়াছে, এখন লাল সূতায় বাঁধা আধারটির উপর নিরুপায় গৃহস্বামীর শ্যেনদৃষ্টি পড়িল। সঙ্গে সঙ্গে মনে জাগিল অনিষ্টের আতঙ্ক, পত্নীর বিক্ষোভ, দৈবের প্রতি অশ্রদ্ধাজনিত অপরাধ। কিন্তু তখনও ভিতর হইতে ক্ষুধাতুর সন্তানের আর্ত্তনাদ উঠিতেছিল।

সমস্ত সঙ্কোচ সবলে কাটাইয়া অর্দ্ধমলিন জামাটি গায়ে চড়াইতে চড়াইতে সে রাস্তায় বাহির হইয়া পড়িল।

রাণা প্রতাপের ধৈর্য্যের সীমা ছিল না শুনা যায়। রাজৈশ্বর্য্য হারাইয়া সকল দুঃখ কষ্টই তিনি বরণ করিয়াছিলেন। কিন্তু আরাবলীর দুর্গম বনে যেদিন তাঁহার শিশু সন্তানদের মুখের রুটি কাড়িয়া লইয়া বন্য কাঠবিড়ালী ছুটিয়া পালায় এবং রুটির শোকে শিশুরা কাঁদিয়া অস্থির হয়,—সেদিন অতবড় মহাবীরের ধৈর্য্যের বাঁধনও ছিঁড়িয়া গিয়াছিল; ক্ষুধাতুর শিশু সন্তানের মুখ চাহিয়া অতি বড় হীনতাকেও অবলম্বন করিতে হাত বাড়াইয়াছিলেন। অভাবের এমন সঙ্গীন অবস্থায় সুকুমারকে ইষ্টকবচের মোহ কাটাইতে দেখিয়া তাহার ইষ্টদেবতাও অশ্রুসংবরণ করিতে পারিয়াছিলেন কি?

তিন

সুকুমারের বাড়ী চেতলায়, অদূরেই এ অঞ্চলের প্রসিদ্ধ হাট। পরিচিত এক স্বর্ণকারের দোকানে ঢুকিয়াই সুকুমার কহিল,—দেখুন, ভেতরের ভূর্জ্জপত্রে লেখা কবচটি বাঁচিয়ে এর সোনাটুকু কেটে বার করুন ত।

দোকানের মালিক ধনেশ্বর ধাড়া কবচটি হাতে লইয়া সুকুমারের মুখের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চাহিয়া প্রশ্ন করিল,—বেচবেন?

সত্যের উপর একটা সুশোভন আবরণ টানিয়া সুকুমার উত্তর দিল,—আর বলেন কেন, জ্যোতিষী ঠাকুর ব্যবস্থা দিয়েছেন, বুধের

দশা কেটে এখন রবির দশা পড়েছে ; কাজেই সোনা পালটে তামার পাতে কবচ ভরে ধারণ করা চাই। সোনাটা ওজন করে দাম ধরুন, আর খাঁটি তামার পাতে ঠিক এই রকম করে এটা ভরতে যে আন্দাজ খরচ পড়বে সেটা কেটে রাখুন।

ধাড়া মনে মনে হাসিয়া কাজে হাত লাগাইল। এইরূপ ব্যাপারে শাঁখের করাত চালাইতে চিরদিনই সে সিদ্ধহস্ত। সুকুমার তাড়া দিল,—শীগগীর কাজটা সেরে নিন, দেখছেন ত এখনও নাওয়া খাওয়া হয়নি।

অর্দ্ধ ঘণ্টার মধ্যে হাতের কাজ সারিয়া, কাটা সোনাটুকু কষিয়া, ওজন করিয়া, হিসাব জুড়িয়া ধনেশ্বর ধাড়া গম্ভীর ভাবে রায় প্রকাশ করিল,—দাম হচ্ছে আপনার সাঁয়ত্রিশ টাকা সাত আনা তিন পাই ; তামার পাতে এটাকে বানাবার যে ফরমাস দিলেন, তার জন্য তিন টাকা জমা রাখছি—

ব্যগ্র উল্লাসে সুকুমার কহিল,—বেশ, বেশ, তাই রাখুন, তাহলে আমি পাচ্ছি—চৌত্রিশ টাকা—

ওষ্ঠপ্রান্তে তীক্ষ্ণ হাসির ঝিলিক তুলিয়া ধাড়া কহিল,—হাঁ, চৌত্রিশ সাত আনা তিন পাই আপনার পাবার কথা, কিন্তু এর মধ্যে একটু গোল আছে—

সুকুমার নিরুত্তরে স্তব্ধ বিস্ময়ে ধাড়ার মুখের দিকে চাহিল। ধাড়া হাসিমুখে গোলের কথা খোলসা করিয়া দিল,—পেছলী হিসেবে বন্ধকী খাতে আপনার কাছে আমাদের পাওনা আছে সতেরো টাকা তিন পাই। সে টাকাটা কেটে নিয়ে আপনাকে দিচ্ছি কুড়ি টাকা সাত আনা।

দুই চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া সুকুমার কহিল,—সে কি! আমি ত জানি, আপনার কাছে যে জিনিস বন্ধক দেওয়া ছিল, তা খালাস করা সুবিধা হবে না বুঝে, আপনাকে জবাব দেওয়া হয়েছে।

ধাড়া পূর্ব্ববৎ হাস্যমুখেই জানাইল,—তা দিয়েছিলেন। কিন্তু সে সময় হাতনাগাৎ সুদের হিসেব জুড়ে আসলের ওপর যে পাওনা হয়, জিনিসগুলো সেইদিনের দরে বেচে ঐ টাকাটাই ঘাঁটতি হয়েছিল কিনা!

সুকুমার আবেগভরে কহিল,—আমি আপনার কথাই মেনে নিচ্ছি, ঐ দেনা স্বীকার করছি, কিন্তু আমার একান্ত অনুরোধ, এ টাকা থেকে এটা এখন কেটে নেবেন না।

ধাড়ার মুখের হাসিটুকু এবার মুখেই মিলাইয়া গেল। স্বর দৃঢ় করিয়া কহিল,—এমন অনুরোধ করবেন না, কর্ত্তা! এটা কারবার, পাওনা টাকা হাতে পেয়ে আমরা ছেড়ে দিতে নাচার। আপনি কিছু মনে করবেন না।

অসহিষ্ণুভাবে উঠিয়া সুকুমার কহিল,—যা আপনার ধর্ম্মে হয় করুন, যা দেবার হয় দিন।

দুইখানি দশ টাকার নোট, একটি সিকি, তিনটি আনি, ও সেই সঙ্গে বাদামী কাগজে লেখা একখানি ফর্দ্দ সুকুমারের হাতে দিয়া ধাড়া নিতান্ত বিনীতভাবে কহিল,—এতে সব লেখা আছে; একটি পাই পয়সার এদিক ওদিক হয়নি জানবেন।

নিরুত্তরেই দোকান হইতে বাহির হইয়া সুকুমার হাটের ভিতর ঢুকিল।

বেলা তখন দেড়টা। অভুক্ত তিন পুত্র টিফিনের ছুটির পর

পরিপূর্ণ ক্ষুধা লইয়া বাড়ীতে উপস্থিত। ছবি তখন আর কোন উপায় না দেখিয়া একখানা ভাঙ্গা তক্তার সাহায্যে উনান জ্বালিয়া চারিটি চাল ভাজিতে বসিয়াছে। ভাঁড়ারের নানাস্থান হইতে কুড়াইয়া এই চাউলগুলি সে সংগ্রহ করিয়াছিল। ক্ষুধার্ত্ত শিশুদের ব্যগ্র দৃষ্টি এই পরম বস্তুটির দিকে নিবদ্ধ। সে করুণ দৃশ্য কি মর্ম্মস্পর্শী। ডাগর ছেলে তিনটি আয়োজনের অবস্থা দেখিয়া দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিল, বুঝিল, বিধাতা আজ তাহাদের অদৃষ্টে বুঝি ইহার অতিরিক্ত ব্যবস্থা করেন নাই।

ঠিক এই সময় বাহিরের দরজার কড়া প্রবলবেগে ঝঙ্কার দিয়া উঠিল। পরিচিত শব্দে সকলেই উৎকর্ণ, ঊষা ছুটিয়া গিয়া দ্বার খুলিয়া দিল, সঙ্গে সঙ্গে উচ্ছ্বসিত উল্লাসে চীৎকার করিয়া কহিল, —অ মা, বাবা এসেছেন, সঙ্গে দুটো মুটে, কত সব জিনিস, এক চ্যাঙড়া খাবার!

মুহূর্ত্তে নিরানন্দ গৃহখানি পরমানন্দে পূর্ণ হইয়া গেল। ছবি তাড়াতাড়ি উনান হইতে কড়া নামাইয়া স্বামীর রৌদ্রতপ্ত মুখখানির দিকে চাহিয়া ব্যথার সুরে কহিল,—ওমা, একেবারে যে খুন হয়ে এসেছ, বস এইখানে, ঊষা শীগগীর পাখাখানা নিয়ে আয়—

অভাবজনিত যে অভিমান এই অসহায় দম্পতির নিম্মল দুইটি মনের মধ্যে ব্যবধান তুলিয়াছিল, তাহা একেবারে নিশ্চিহ্ন হইয়া গেল।

চার

শ্রীদুর্গা চিত্রালয়ের কাজগুলি ছিল যেমন কঠিন, তেমনই তাহার সমাধানও সময়সাপেক্ষ। কিন্তু এই কার্য্যের উপরই সুকুমারের শারদীয়া পূজার মান সম্ভ্রম সমস্তই নির্ভর করিতেছিল। একটি মাস দিবারাত্রি খাটিয়া, শারদীয়া পঞ্চমীর পূর্ব্বাহ্ণেই ডিজাইনগুলি সম্পূর্ণ করিয়া সে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিল।

ছবিও ঠিক সেই সময় আসিয়া সংসারের খবর দিল,—এবেলা পর্য্যন্ত কোন রকমে চলে গেল,—ও বেলায় সব বাড়ন্ত, কয়লাটি পর্য্যন্ত।

হাতের কাজ শেষ করিয়া শিল্পীর মন তখন উৎসাহে ভরপুর, স্ফূর্তির সুরে কহিল,—আমি ফিরে এলে সব আনিয়ে নিও।

শ্রীদুর্গা চিত্রালয়ের পেমেণ্ট ভাল, টাকার জন্য হাঁটাহাঁটি করিতে হয় না, বিশেষতঃ জরুরী কাজ যখন শেষ করিয়া লইয়া চলিয়াছে এবং কাজগুলির সম্বন্ধে তাহার নিজের মনেও যখন কোনও খুঁৎ ধরা দিতেছে না, তখন উচ্চহারেই যে পারিশ্রমিক পাইবে তাহাতে সন্দেহ কি!

আহার সারিয়াই ডিজাইনগুলি লইয়া সুকুমার মধ্যাহ্নেই বাহির হইয়া পড়িল। দুইটী মাত্র পয়সা তাহার আজ শেষ সম্বল, ইহাতেই পাথেয় সারিতে হইবে। ট্রাম কোম্পানীর সৌজন্যে চেতলার মোড় হইতে চৌরঙ্গী পর্য্যন্ত মধ্যাহ্নে এই অর্দ্ধ আনা মাত্র সম্বল করিয়া অনায়াসে যাওয়া চলে। সুকুমারও চলিল।

চৌরঙ্গী অঞ্চলেই শ্রীদুর্গা চিত্রালয়। মালিক অবিনাশ আতর্থীকে কার্য্যালয়ের একপ্রান্তে পরদা-ঘেরা খাস কামরায় উপস্থিত দেখিয়া সুকুমার যেন হাতে স্বর্গ পাইল। পরদা ঠেলিয়া বরাবর তাঁহার সম্মুখে গিয়া ডিজাইনগুলি দাখিল করিতেই আতর্থী মহাশয় গম্ভীর হইয়া কহিলেন,—অত্যন্ত দেরী করে ফেলেছেন আপনি,—পূজো মাথায় করে আজ এলেন ?

সুকুমার সবিনয়ে কহিল,—কাজগুলো খুবই শক্ত, তাড়াহুড়ো করে শেষ করবার নয়। কাজের তুলনায় দেরী হয়েছে মনে হয় না।

পুনরায় প্রশ্ন—সবগুলোই শেষ করেছেন ?

উত্তর হইল,—নিশ্চয়ই।

আর কোনও কথা নাই। আতর্থী মহাশয় নিজের কাজে নিমগ্ন হইলেন, সুকুমার সম্মুখের চেয়ারখানির উপর বসিয়া একাগ্রদৃষ্টিতে তাঁহার মুখের দিকে তাকাইয়া রহিল।

এই ভাবে অর্দ্ধ ঘণ্টা অতীত হইল। সহসা আতর্থী মহাশয়ের দৃষ্টি পড়িল সুকুমারের উপর। ডিজাইনগুলি তাঁহার টেবলের উপরেই পড়িয়াছিল। সুকুমারের দিকে চাহিয়া সেগুলি হাতে তুলিয়া কহিলেন,—তাহলে এগুলো এখন থাক, আমি অবসর মত দেখব ; আপনি পূজোর পর আসবেন।

সুকুমারের বুকের ভিতর ঢিপ ঢিপ করিয়া উঠিল। এমন কথা শুনিবে, সে যে কল্পনাও করে নাই ; তাহার যে শিরে সংক্রান্তি আজ! গাঢ় স্বরে সে কহিল,—আমি যে আজই টাকা পাব বলে এসেছি, স্যর! সমস্ত কাজ ফেলে আমি এ কাজ শেষ করেছি এই আশাতেই যে! আমাকে—

আতর্থী মহাশয় সুকুমারকে কথা শেষ করিতে না দিয়াই কহিলেন,—পূজো মাথায় করে আপনি টাকার আশায় এসেছেন? এতদিন করছিলেন কি? কাজগুলো যা করে আনলেন, আমাকে দেখতে দিন; আর, টাকাও ত আগেই আপনাকে কতক দিয়ে রেখেছি। যা হোক, সাত আট দিন পরে আপনি আসবেন, সেইদিন কথা হবে।

সুকুমারকে আর কোনও কথা কহিবার অবসর না দিয়াই আতর্থী মহাশয় বিশেষ ব্যস্তভাবে উঠিয়া পড়িলেন। সুকুমারের মনে হইল চেয়ার শুদ্ধ সে যেন ভূগর্ভে নামিয়া চলিয়াছে।

শ্রীদুর্গা চিত্রালয় হইতে বাহির হইয়া সুকুমার যখন রাস্তায় নামিল, তখন তাহার চেহারা একেবারে বদলাইয়া গিয়াছে। কত বড় আশা লইয়া সে এই বাড়ীতে ঢুকিয়াছিল, আর সর্ব্বহারার মত কতখানি দুশ্চিন্তা লইয়া সে ফিরিয়া চলিল; তাহার মর্ম্মব্যথা কে অনুভব করিবে? পকেটে একটি পয়সা নাই, মনে উৎসাহ নাই, দেহে সম্বিত নাই; বাতাসের উপর দেহভার ন্যস্ত করিয়া সে যেন অগ্রসর হইল। তাহার চক্ষুর সম্মুখে অগ্নির অক্ষরে কে যেন অনবরতই লিখিতেছিল—কাল শারদীয়া ষষ্ঠী!

দুর্ব্বল দেহখানিকে টানিয়া এ অবস্থাতেও পরিচিত কয়েক স্থানে সুকুমার টাকার চেষ্টায় ফিরিল। কিন্তু সর্ব্বত্রই শুনিল একই কথা,—পূজার মুখ, একটি পয়সা এখন মোহর; নিরুপায়!

আসিবার সময় বুকে ছিল অপরিসীম আশা, ফিরিবার সময় কোনও সম্বলই নাই,—বরং শূন্য পকেটের ভার দুর্ব্বহ হইয়াই তাহাকে দারুণ ব্যথা দিতেছিল। শূন্য ঝুলি যে কত ভারী—

বিমুখ ভিখারীই তাহার মর্ম্ম বুঝিতে পারে। স্বয়ং কাশীহারা শিবও একদিন ইহার ব্যথা অনুভব করিয়াছিলেন! সারা পথ হাঁটিয়া রাত্রি আটটার পর সুকুমার বাড়ী ফিরিল,—বাড়ীর সকলে তখন সাগ্রহে তাহারই মুখ চাহিয়া কত আশায় প্রতীক্ষা করিতেছিল!

স্বামীর বিবর্ণ মুখখানি দেখিয়াই ছবির বুকের ভিতর ছ্যাঁৎ করিয়া উঠিল। কোনও কথা না বলিয়া জুতা যোড়াটি ছাড়িয়া সুকুমার শয্যার উপর শিথিল দেহখানি ঢালিয়া দিল।

সুকুমার একটু সুস্থ হইলে ছবি সকল কথাই শুনিল। আজ সে স্বামীকে প্রবোধ দিয়া কহিল,—তুমি ভেবো না, মালিক একজন আছেনই; তিনিই সব ব্যবস্থা করবেন।

সে রাত্রিতে কিন্তু বাড়ীর আটটি প্রাণীর ক্ষুধা-নিবারণের কোনও ব্যবস্থাই আর হইল না। রাতটুকু অনশনেই কাটিয়া গেল।

পাঁচ

সকালে উঠিয়াই ছবি কহিল,—আমার একটা কথা শুনবে?

উদাসভাবে সুকুমার তাহার মুখের দিকে চাহিয়া কহিল,—বল।

ব্যগ্রকণ্ঠে ছবি কহিল,—যে সাহেবের কাজ তুমি আগে করতে, আজ তার সঙ্গে দেখা কর।

প্রস্তাবটা তৎক্ষণাৎ সুকুমারের চিত্তে একটা প্রচণ্ড দোলা দিল। আর্থিক ব্যাপারে এই বিদেশী প্রতিষ্ঠানটির উদারতার স্মৃতি তাহাকে অভিভূত করিয়া ফেলিল। সত্য বটে, কোম্পানী তাহার প্রতি ভাল ব্যবহার করে নাই, নালিশ করিয়া তাহার দুর্দ্দশার চূড়ান্ত

করিয়াছিল। কিন্তু তাহার দিক দিয়াও ত যথেষ্ট অপরাধ ছিল। অসুখের সংবাদ তাহাদের দেওয়া হয় নাই, অসুখের পরও সে নিজে গিয়া দেখা করে নাই; মধ্যস্থ দিয়া মীমাংসা করিয়াছে। অথচ, এই কোম্পানী হইতে সময়ে অসময়ে কি প্রচুর টাকাই না সে পাইয়াছে! সুকুমারের অবসন্ন চিত্ত পুনরায় যেন উৎসাহে দীপ্ত হইয়া উঠিল। কহিল,—আচ্ছা, ভেবে দেখি।

যাহা ভাবিবার, সে আগেই ভাবিয়া লইয়াছিল। যদিও আজ ষষ্ঠী, বাঙ্গালীর সংসারে এ দিনটির প্রচুর মর্য্যাদা, কিন্তু এ বাড়ীতে আজ একাদশীর ব্যবস্থা।

বেলা তখন আটটা। কাহাকেও কিছু না বলিয়া জামা, চাদর ও ছাতাটি লইয়া সুকুমার দুর্গা বলিয়া বাহির হইয়া পড়িল।

পূর্ব্বদিনের পথশ্রম ও আশাভঙ্গের ব্যথা তখনও কাটে নাই, সারারাত্রি পেটে কিছু পড়ে নাই, সকালে সুকুমারের এক পিয়ালা চা না হইলে চলে না, চালের মত তাহাও আজ বাড়ন্ত, কিন্তু যাহারা অতি বুভুক্ষুর আগ্রহ লইয়া আজিকার সন্ধ্যার প্রতীক্ষা করিতেছে, তাহাদের মূর্ত্তিগুলি বুঝি সুকুমারের মনের ক্ষুধা ও দেহের ক্লান্তি সমস্তই হরণ করিয়া লইয়াছিল। তাই, ছাতাটি মাথায় দিয়া এই অদ্ভুত খেয়ালী মানুষটি পায়ে হাঁটিয়া চলিল চেতলা হইতে ডালহৌসী স্কোয়ারে হ্যাভেল কোম্পানীর চিত্রালয়ে।

শারদীয়া পূজার সম্বর্দ্ধনায় সারা সহরে উৎসবের অন্ত নাই। সকল কর্ম্মশালা ও পণ্য প্রতিষ্ঠানে আনন্দের হাট বসিয়া গিয়াছে। শোভা ও সমৃদ্ধির পসরা মাথায় তুলিয়া প্রত্যেকেই শীর্ষস্থানে উঠিতে একান্ত উন্মুখ।

আপন মনে সুকুমার গন্তব্য পথে চলিয়াছে। সারা পথের দুই পার্শ্বে দোকানী-পশারীদের অসীম উৎসাহ ও একান্ত প্রীতি-প্রসন্নভাব দেখিয়া মনে মনে ভাবিল, অভাবের সঙ্গে এদের বুঝি কখনও দেখা সাক্ষাৎ হয় নাই।

ভবানীপুরের মোড়ে একখানা বড় বাড়ীর সম্মুখে পাতা পুরুয়া বোঝাই একটা লরি আসিয়া দাঁড়াইল। ইতিমধ্যেই গৃহখানি পূজার উল্লাসে উছলিয়া উঠিয়াছে,—আজ হইতেই সেখানে 'দিয়তাং ভোজ্যতাং' ব্যাপার!

সুকুমার সে দিকে চাহিয়া মনে মনে ভাবিতে থাকিল,—এখানে এত ঘটা, আর আমার বাড়ীতে আজ হাঁড়ী চড়বে না; ছেলেমেয়ে উপোস ক'রে কাটাবে! কিন্তু আমাকে দেখে, কজন একথা বুঝবে বা বিশ্বাস করবে! অবিনাশ আতর্থীরই বা কি দোষ! তিনি লক্ষপতি, আমার মত অভাবগ্রস্তের অবস্থার সঙ্গে তিনি ত পরিচিত নন; তাঁর কাছ থেকে সে দিন রিক্ত হস্তে ফিরে সারা পথ হেঁটে এসেছি, সারারাত সপরিবার অনশনে কাটিয়েছি—এ কথা কি তিনি বিশ্বাস করবেন কোনদিন!

মোড় ফিরিতেই একটা লোক আসিয়া গা ঘেঁসিয়া হাত পাতিল—একটা পয়সা দিন, বাবু, আজকের দিনে, ভগবান মনস্কামনা আপনার পূর্ণ করবেন।

সুকুমার চাহিয়া দেখিল, আধ-ময়লা কাপড় পরা, গায়ে একটা জালিদার ময়লা গেঞ্জি, গলায় ফের দেওয়া একখানা সুতি-উড়ানী, চেহারাখানা একেবারে অভদ্র গোছের নয়; বয়স বোধ হয় চল্লিশের কোঠা পার হয় নাই—এমন একজন প্রার্থী হাত পাতিয়া দাঁড়াইয়াছে।

হাতে পয়সা থাকিলে সুকুমার প্রার্থীকে বড় একটা ফিরাইত না, আজ নিজেই সে রিক্ত ; গুটিকয়েক পয়সার জন্য চেতলা হইতে এতটা পথ হাঁটিয়া আসিয়াছে। মুখ ফিরাইয়া মনে মনে বলিল,—ভাইরে, তোর অবস্থা হয ত আমার চেয়ে ভাল ; সহস্র দোর তোর সামনে খোলা, অভাবে যার তার কাছে হাতখানা পেতে দাঁড়াতে মনে সঙ্কোচ নেই, কিন্তু আমার মত অবস্থার লোক যারা, তারা—

ধার চাইতে হয়—সেও আট ঘাট বাঁধিয়া, যদি চাওয়ার কথাটা প্রচার হইয়া পড়ে! অবস্থা লইয়া পাছে আলোচনা সুরু হয়, তখন? লজ্জায় এই সুকুমারের মত অভাবগ্রস্ত ভদ্রদের চিত্ত কত প্রকারেই আজ সঙ্কুচিত করিয়া রাখিয়াছে,—লজ্জাগত এই দুর্ব্বলতা কত গভীরতর সমস্যার সৃষ্টি করিয়া চলিয়াছে। কিন্তু ইহার সমাধানের সম্ভাবনা কোথায়?

হ্যাভেল কোম্পানার চিত্রালয়ের দেউড়ীতে প্রবেশ করিতেই, জমাদার সুকুমারকে চিনিতে পারিয়া হাতের খৈনী লুকাইয়া সসম্ভ্রমে কুর্নিশ করিল, কুশল সংবাদ লইল। উপরে উঠিতেই তাহাকে দেখিয়া কর্ম্মচারীরা ছুটিয়া আসিল। সুকুমার এখানে সর্ব্বজন-পরিচিত, তাহার প্রতি কর্ম্মচারীদের অসীম শ্রদ্ধা।

কর্ম্মচারীদের সহিত কথাপ্রসঙ্গে সুকুমার স্তব্ধ বিস্ময়ে শুনিল, তাহার বন্ধুস্থানীয় যে শিল্পীকে মধ্যস্থ করিয়া সে সাহেবের সহিত মীমাংসার ভার দিয়াছিল, সে সুকুমারের বিরুদ্ধে নানা কথা লাগাইয়া, নিজের কাজটুকুই গুছাইয়া লয়। সাহেব তাহাকে সুকুমারের স্থলে নির্ব্বাচিত করেন। কিন্তু ধর্ম্মের কল বাতাসে নড়িয়া গিয়াছে ; তাহার কাজে বহু গলদ বাহির হইয়াছে, উপরন্তু

অনেকগুলি টাকা অগ্রিম লইয়া সে এখন ফেরার, তাহার নামে হুলিয়া বাহির হইয়াছে। বহু কাজ জমিয়া গিয়াছে, ভাল লোক পাওয়া যাইতেছে না; সুকুমার ঠিক সময়টিতেই আসিয়াছে, সাহেব তাহাকে পাইলে লুফিয়া লইবে।

সুকুমার সাহেবের কাছে নামের স্লিপ পাঠাইবামাত্রই তলব হইল। কর্ম্মচারীরা কহিল,—দেখুন স্যর, একেই বলে গরজ বড় বালাই, এত শীগগীর কোনো বাঙ্গালীকে কোনো সাহেব ডাকে না।

ছয়

মিষ্টার হিউম নামে এক ইংরেজ এই চিত্রালয়ের সিনিয়ার পার্টনার ও ম্যানেজিং ডাইরেক্টর। যেমন দীর্ঘদেহ হৃষ্টপুষ্ট নিটোল আকৃতি, তেমনই তীক্ষ্ণ প্রকৃতি এবং সেই অনুপাতে সাহেবের কর্ত্তব্যবুদ্ধিও একান্ত প্রখর। কিন্তু বাহিরের এই তীক্ষ্ণ কঠিন প্রকৃতির ভিতর সাহেবের যে ভাবপ্রবণ হৃদয়টি প্রচ্ছন্ন হইয়া থাকিত, বিশেষ অন্তরঙ্গ ব্যতীত অতি অল্প লোকই তাহার সন্ধান পাইয়াছে।

সুকুমার সাহেবের কামরায় ঢুকিয়া অভিবাদন করিতেই, সাহেব হাতের কলম রাখিয়া সবেগে উঠিয়া কহিলেন,—হাল্‌লো! পরক্ষণে তাহার হাত ধরিয়া সম্মুখের চেয়ারে তাহাকে বসাইয়া দিয়া নিজে বসিলেন। তখনও সাহেবের বদ্ধদৃষ্টি সুকুমারের মুখে, বিস্ময়ের সুরে কহিলেন,—এমন চেহারা হয়েছে তোমার, সুকুমার বাবু! তুমিই কি সেইই?

সুকুমার আজ লজ্জায় জড়সড়। মিষ্টার হিউমের নিকট এতটা

সম্মান পাইবে, সে তাহা প্রত্যাশাও করে নাই। কুণ্ঠিতভাবে কহিল,—আমার প্রতি এখনও আপনার এত দয়া—

সাহেব দৃঢ়স্বরে কহিলেন,—দয়া নয়, শ্রদ্ধা। তুমি একজন আর্টিষ্ট, আমি আর্টব্যবসায়ী,—তোমার ওপর শ্রদ্ধা আমার স্বাভাবিক। জান তুমি, ইংলণ্ডে আর্টিষ্টদের কত সম্মান—তাদের স্থান কত উঁচুতে ?

সুকুমার এ কথার কি উত্তর দিবে! অন্যদিন হইলে সে হয়ত চুপ করিয়াই থাকিত, কিন্তু আজ বড় দুঃখেই তাহার মুখ দিয়া সাহেবের কথাটির নির্ঘাত উত্তর বাহির হইয়া গেল! সে কহিল,—ইংলণ্ডের কথা জানিনা স্যর, কিন্তু এ দেশে এমন আর্টিষ্টও আছে, জাতীয় পর্ব্ব-দিনটিতেও যাদের রান্নাঘর বন্ধ থাকে, সপরিবার অনশনে কাটায়!

বিস্ময়ের সুরে সাহেব কহিলেন,—কি বলছ তুমি, সুকুমার?

আর্ত্তস্বরে সুকুমার কহিল,—যা সত্য, সেই কথাই বলছি, স্যর! সেই আর্টিষ্ট আপনার সামনেই বসে আছে।

পূর্ণ দুটি মিনিট সুকুমারের শুষ্ক মুখের উপর তীক্ষ্ণ দুইটি চক্ষু রাখিয়া সাহেব যেন শিহরিয়া উঠিলেন। তাহার পর কণ্ঠস্বর মৃদু করিয়া কহিলেন,—দেখছি এ একটা রহস্য; কিন্তু কোনো প্রতিভাশালী আর্টিষ্ট দুঃখ ভোগ করে, এ আমার অসহ্য। এ রহস্য তুমি প্রকাশ করবে, সুকুমার;—অবশ্য যদি না আপত্তি তোমার থাকে।

সুকুমার কহিল, কোনও আপত্তিই নেই, স্যর, কিন্তু সে অনেক কথা।

সাহেব এবার স্বর উচ্চে তুলিয়া কহিলেন,—নেভার মাইণ্ড, তুমি বলে যাও। আমারও অনেক কথা আছে তোমাকে বলবার। কিন্তু তার আগে তোমার কথা আমি শুনতে চাই।

সুকুমার তাহার দুর্ভাগ্য জীবনের সকল কথাই সাহেবকে শুনাইয়া দিল। শেষ পর্য্যন্ত সাহেব ধৈর্য্য রাখিতে পারিলেন না, দুইটি চক্ষুর উদগ্র অশ্রু রুমালে মুছিয়া গাঢ়স্বরে কহিলেন,—সুকুমার, তুমি শুধু ছবি আঁকতেই শিখেছ, হিসেব করতে শেখোনি, তাই জীবনের অঙ্ক কসতে এত বড় ভুল করে ফেলেছ, যার জন্য একটা পরিবার আজ আত্মহত্যা করতে বসেছে! ও! এমনি বেয়াকুব তুমি, এত বড় বেহুঁসিয়ার!—বেয়ারা!

উষ্ণীপরা মাদ্রাজী বেয়ারা সাহেবের কামরায় ঢুকিয়া আভূমি নত হইয়া সেলাম বাজাইল।

বাবুকা ওয়াস্তে চা লেয়াও জল্‌দি আউর কুছ মিঠা।—এখনও তোমার খাওয়া হয়নি, সুকুমার, কি খাবে—বেয়ারাকে বলে দাও—

সুকুমার মিনতির স্বরে কহিল,—সাহেব আমাকে ক্ষমা করুন; শুনলেন ত, বাড়ীতে সবাই আমার মুখ চেয়ে বসে আছে, এক পিয়ালা চা পর্য্যন্ত আজ তাদের অদৃষ্টে যোটেনি,—তাদের ফেলে আমি এখানে কিছুই খেতে পারব না।

বেহারাকে বিদায় দিয়া সুকুমারের দিকে চাহিয়া সাহেব কহিলেন,—ধন্যবাদ বাবু! তোমার এই আপত্তি আমাকে আরো খুসী করেছে। কিন্তু এই সঙ্গে গভীর দুঃখে আমাকে বলতে হচ্ছে—এখনই তুমি বাড়ী ফিরে যাও।

শুষ্ক মুখখানি ম্লান করিয়া সুকুমার কহিল,—আপনার মূল্যবান সময়ের অনেকটা বৃথা নষ্ট করে গেলুম, স্যর! তাহলে গুড্‌বাই—

সাহেব ক্ষিপ্রবেগে উঠিয়া বহির্গমনোন্মুখ সুকুমারের হাতে একটা প্রবল ঝাঁকুনি দিয়া কহিলেন,—সিলি বয়! আবার তুমি হিসেবে ভুল করছ! খালি হাতে বাড়ী গিয়ে শেষে কি আমাকে শুদ্ধ করোনারের কোর্টে টানবে?

সুকুমারের সর্ব্বাঙ্গ তখন আড়ষ্ট, মুখে কথা নাই, বাষ্পার্দ্র দুইটি চক্ষুর দৃষ্টিও যেন নিষ্প্রভ।

সাহেব উচ্ছ্বাসের স্বরে কহিলেন,—দেখ বাবু, ইংরেজ ব্যবসায়ীর জাত, মানুষ চেনে। যাকে উপলক্ষ্য করে তারা উপায়ের আশা রাখে, তাকে নষ্ট হতে দেয় না। যার কাছে তারা উপকার পায়, সহজে তার অপকার করে না। তবে তোমার প্রতি যে রূঢ় ব্যবহার হয়েছে, তার মূলে কতকটা ব্যবসায়গত প্রেষ্টিজ রক্ষা, কতকটা তোমার সমব্যবসায়ী বন্ধুর বিশ্বাসঘাতকতা। গোড়াতেই তোমাকে বলেছি, আমরা ব্যবসায়ীর জাতি, চুক্তি ভঙ্গ আমরা বরদাস্ত করতে পারি না, যেহেতু এই কনট্রাক্টই আমাদের ব্যবসায়ের প্রাণ।

সুকুমার নিরুত্তরে সাহেবের মর্ম্মস্পর্শী কথাগুলি শুনিতেছিল, তাহার মুখ দিয়া একটি কথাও বাহির হইল না।

সাহেবের সকল কথা তখনও বলা হয় নাই। বক্তব্য কথার মোড় ফিরাইয়া পূর্ব্ববৎ উচ্ছ্বাসের সহিত পুনরায় কহিলেন,—হাঁ, তোমার ত্রুটির শাস্তি আমরা কঠোর ভাবেই দিয়েছি, কিন্তু তোমার কাছ থেকে যে কাজগুলি আমরা পেয়েছি, তাতে শুধু যে

আমরা লাভবান হয়েছি তা নয়, আমাদের ফারমের প্রেষ্টিজ্ও তাতে বেড়েছে। আজ তুমি বিপন্ন হয়েছ, এ সময় আমাদের কর্ত্তব্য তোমাকে সর্ব্বতোভাবে রক্ষা করা। উপস্থিত আমি তোমাকে কিছু টাকা দিচ্ছি, তাতে আজকের ঝঞ্ঝাটগুলো সব মিটিয়ে ফেলো। আমি তোমাকে চেক দেব না, কেন না ব্যাঙ্কে গিয়ে চেক ভাঙিয়ে টাকা পেতে বিলম্ব হবে; শীঘ্র তোমার বাড়ী পৌঁছানো প্রয়োজন।

সুকুমারের দুই চক্ষু ছাপাইয়া তখন অশ্রুর বন্যা ছুটিয়াছে। ভাবগদ্‌গদ্‌স্বরে সে কহিল,—স্যর, আমার মত একটা নগণ্য লোকের সম্বন্ধেও আপনি এত ভাবেন, এমন আপনার দয়া!

সাহেব সুকুমারের কথার উত্তর না দিয়া একখানি স্লিপে কয়েক ছত্র লিখিয়া তাহার হাতে দিলেন; কহিলেন,—ক্যাস থেকে এই টাকাটা নিয়ে বাড়ী চলে যাও। আমি বেয়ারাকে বলে দিচ্ছি, আমার সোফার তোমাকে বাড়ী পৌঁছে দিয়ে আসবে।

স্লিপের লেখাটির উপর দৃষ্টি পড়িতেই সুকুমার শিহরিয়া উঠিল; সাহেব তাহাকে পাঁচ শত টাকা দিবার আদেশ দিয়াছেন!

সাহেবকে ধন্যবাদ দিয়া—ভগ্নস্বরে কৃতজ্ঞতা জানাইয়া সুকুমার যখন বিদায় লইতে উদ্যত, তখন সাহেব পুনরায় কহিলেন,—এক মিনিট বাবু, আর একটা কথা তোমাকে বাধ্য হয়েই বলছি শোনো। দেখো, ঈশ্বর সৃষ্টি করেন মানুষকে। কিন্তু মানুষের মধ্যে যারা কেতাবের ক্যারেকটার বা আর্টের পিকচার সৃষ্টি করেন, তাঁরা ঈশ্বরের অনুগৃহীত। এঁদের সৃষ্টির বিষম অন্তরায় হচ্ছে আর্থিক অভাব। এই জন্যই ইংলণ্ডে আর্টিষ্টদের আর্থিক মর্য্যাদা প্রচুর। তুমি যদি আমাদের ওপর সম্পূর্ণ নির্ভর করতে পারো,

আমরাও তোমার সম্পূর্ণ ভার নিতে পারি—যাতে আর্থিক অভাব তোমার শিল্প সাধনায় অন্তরায় হতে না পারে।

সুকুমার দৃঢ়স্বরে উত্তর দিল,—আমি সম্পূর্ণ প্রস্তুত স্যর, আজ থেকে আমি আপনার চিত্রালয়েই আত্মনিয়োগ করলুম।

সাহেব সানন্দে সুকুমারের করমর্দ্দন করিয়া কহিলেন—থ্যাঙ্ক য়ু; কাল এই সময় তুমি আসবে, নতুন কনট্রাক্ট করব তোমার সঙ্গে।

আফিসের ফটকে সাহেবের সুবৃহৎ মোটর সুকুমারের প্রতীক্ষা করিতেছিল। সুকুমারকে দেখিয়াই সোফার দরজা খুলিয়া দিল। সুকুমার মোটরে উঠিবার উপক্রম করিয়াছে, এমন সময় অবিনাশ আতর্থীর মোটর আসিয়া পার্শ্বে দাঁড়াইল। আতর্থী মহাশয় চিত্র-সংক্রান্ত কোনও প্রয়োজনে হ্যাভেল কোম্পানীর চিত্রালয়েই আসিতেছিলেন। সুকুমারকে সাহেবের মোটরে উঠিতে দেখিয়া একান্ত বিস্ময়ে তিনি প্রশ্ন করিলেন,—ব্যাপার কি সুকুমারবাবু, আপনি যে এখানে?

সুকুমার শ্রদ্ধাসহকারে আতর্থী মহাশয়কে নমস্কার করিয়া কহিল,—হিউম সাহেবের কাছেই এসেছিলুম।

অপ্রসন্নভাবেই অবিনাশ আতর্থী কহিলেন,—সাহেবের সঙ্গে আপনার সম্বন্ধ যে চুকে গিয়েছিল শুনেছিলুম?

সুস্পষ্টস্বরে সুকুমার উত্তর দিল,—দায়ে পড়ে আবার কেঁচে গণ্ডূষ করলুম!

আতর্থী মহাশয়ের সুন্দর মুখখানির উপর সেই মুহূর্ত্তে কে যেন এক ঝলক কালি ঢালিয়া দিল! বাহিরে ব্যবসায়ীসুলভ নীতির দিকে চাহিয়া যে ব্যবহারই তিনি করুন, কিন্তু এই প্রতিভাশালী

শিল্পীর সৃষ্টিশক্তি সম্বন্ধে তাঁহার ধারণাও ছিল খুবই উচ্চ। অভাব-গ্রস্ত শিল্পী তাঁহার হাতের মুঠার মধ্যে আসিয়া ধরা দিয়াছে, ইহাই তিনি ভাবিয়াছিলেন, কিন্তু এখন বুঝিলেন, কাল অভ্যাসবশে যে ভুল তিনি করিয়াছিলেন, তাহাই এই অতিবাঞ্ছিত মানুষটিকে এত তফাতে আজ সরাইয়া দিয়াছে!

সাত

বাড়ীর সম্মুখে মোটর আসিয়া দাঁড়াইতে ছবির বুকখানা দুলিয়া উঠিল। কোলের ছেলেটিকে ঘুম পাড়াইয়া অনেকক্ষণ ধরিয়াই সে বাহিরের ঘরের গবাক্ষটির সম্মুখে দাঁড়াইয়াছিল। ছেলে মেয়েদের ক্ষুধার তাড়না আজ আর তাহাকে আঘাত দেয় নাই; নিকটেই এক ধনী আত্মীয়ের নূতন গৃহপ্রবেশ উপলক্ষে তাহারা মধ্যাহ্ন ভোজনের নিমন্ত্রণ খাইতে গিয়াছে। ছবি ও তাহার স্বামীকে লইয়া যাইবার জন্য সেখান হইতে তাগিদ আসিয়াছিল, কিন্তু ছবি বলিয়া দিয়াছে, স্বামী কখন ফিরিবেন ঠিক নাই, সে নিজে ষষ্ঠীর ব্রত করিয়া থাকে, নিমন্ত্রণ খাইবার উপায় নাই।

সুকুমারের অনশনক্লিষ্ট মুখখানির উপর আজ একি অপূর্ব্ব জ্যোতিঃ! বহুদিন স্বামীর মুখে এমন পরিতৃপ্তির ভাব ত সে দেখিবার অবকাশ পায় নাই! নির্ব্বাক্ বিস্ময়ে সে স্বামীর মুখের দিকে বদ্ধদৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল।

সুকুমার হাসিয়া প্রশ্ন করিল,—কি দেখছ বল ত? তাহার

পর আস্তে আস্তে পকেট হইতে নোটগুলি বাহির করিয়া ছবির হাতে দিয়া কহিল,—তোমারই মন্ত্রণার ফল।

ছবির শীর্ণ মূর্ত্তি মুহূর্ত্ত মধ্যে অপরিসীম উল্লাসে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল, দুই চক্ষু বিস্ফারিত ক।রয়া আগ্রহের সুরে জিজ্ঞাসা করিল,—সাহেবের আফিসেই তাহলে গিয়েছিলে ?

সুকুমার কহিল,—তোমার যুক্তিটা শুনেই মন দুলে উঠেছিল। দুর্গা বলে সেখানেই গিয়েছিলুম। মা দুর্গা মুখ রেখেছেন। পূজোর ষষ্ঠীর ভাবনায় সারারাত কাল ঘুমুতে পারিনি, তখন কল্পনাও করিনি এই দিনেই হবে আমার নূতন করে ভাগ্যোদয় !

পাওনাদারদের দোকানে দোকানে গিয়া হিসাব মিটাইয়া সুকুমার ছেলেদের সহিত যখন বাড়ী ফিরিল, তখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইযাছে ; শারদীয়া উৎসবের স্চনায় সহরোপকণ্ঠের এই অনাড়ম্বর অঞ্চলেও উল্লাস প্রবাহ বহিযাছে ; দোকানে দোকানে মনোরম সজ্জা পারিপাট্যের ছটা, গৃহে গৃহে তাহার আলোচনা ; সারা বৎসরটির প্রসন্নতা আকর্ষণে পুণ্যশীলা পল্লীললনাদের নিষ্ঠার অন্ত নাই। যাহার যেমন ক্ষমতা পরিজনদের নূতন বস্ত্র সম্ভারে সজ্জিত হইবার অবকাশ দিয়াছে। সুকুমার প্রত্যূষেও কল্পনা করে নাই, তাহার স্ত্রী পুত্র কন্যারা অন্যান্য বৎসরের ন্যায় এই আকাঙ্ক্ষিত শারদীয়া ষষ্ঠীর নিশায় নববস্ত্র পরিয়া তাহার গৃহের ও নিজের দুটি নেত্রের শোভাবর্দ্ধন করিবে !

সুকুমারের বাহিরের ছোট ঘরখানিও আজ সুসজ্জিত, আলোকোজ্জ্বল। নিজের স্থানটিতে সবেমাত্র সে বসিয়াছে, এমন সময় দরোজার সম্মুখে একখানি মোটর আসিয়া দাঁড়াইল।

ছেলেরা বাহিরেই ছিল। মোটরের আরোহী প্রশ্ন করিলেন,—এইটিই কি সুকুমার বাবুর বাড়ী ?

পরিচিত স্বর শুনিয়া সুকুমার শশব্যস্তে বাহিরে আসিয়া ব্যগ্র-কণ্ঠে কহিল,—আতর্থী মহাশয়! আপনি? কি সৌভাগ্য আমার!

এই যে, সুকুমার বাবু! নমস্কার! আমি আপনার কাছেই এসেছি, কথা আছে।

সুকুমার গভীর শ্রদ্ধা সহকারে অবিনাশ আতর্থীকে বাহিরের ঘরে আনিয়া বসাইল। আজ তাহার গৃহে পূর্ব্বেই মালক্ষ্মীর পদছায়া পড়িয়াছে, লক্ষ্মীর বরপুত্রদের আবির্ভাব বিস্ময়ের বিষয় নহে। প্রত্যূষেও এই গৃহে একটি তণ্ডুলকণা ছিল না, দুটি চানাও কেহ দাঁতে কাটিতে পায় নাই; এখন সম্মানীয় অভ্যাগতের সম্বর্দ্ধনায় চা, খাবার, পাণ কিছুরই অপ্রতুল দেখা গেল না।

অবিনাশ আতর্থী অবশেষে গভীর আন্তরিকতার সহিত জানাইলেন,—আপনার ডিজাইনগুলো সব দেখেছি, সুকুমার বাবু! চমৎকার হয়েছে; সত্যই আপনি জিনিয়াস্! কোনো ছবিটির কোনো অংশ বদলাবার কিছু নেই।—আপনাকে এগুলোর জন্য কি দিতে হবে বলুন ত?

কিছুমাত্র চিন্তা না করিয়া বেশ সহজ সুরেই সুকুমার উত্তর দিল,—কিছুই আর দিতে হবে না আপনাকে।

সে কি! আপনি ঠাট্টা করছেন?

আমি আপনাকে শ্রদ্ধা করি, আতর্থী মশাই! ঠাট্টা করবার দুঃসাহস আমার নেই। সত্যই আপনাকে কিছু দিতে হবে না।

কেন বলুন ত! আপনি পরিশ্রম করেছেন—

তা করেছি। হয় ত পয়সার দিকে চেয়ে এমন পরিশ্রম আর কখনো করিনি, কিন্তু সে ত সার্থক হয়নি, অবিনাশ বাবু!

এ কথার মানে?

মানে আপনি বুঝতে পারবেন না; কেননা, এতকাল শিল্পীদের নিয়ে নাড়াচাড়া করেও আপনি তাদের ভেতরের খবরটুকু রাখেন নি, চেষ্টাও করেন নি রাখবার। আজ আপনি চৌরঙ্গী থেকে চেতলায় আমার বাড়ী ব'য়ে এসেছেন অসীম উদারতা দেখাতে, কাল আমি ভিক্ষুকের মত আপনার বাড়ীতে গিয়ে অভাব জানিয়েছিলুম, আপনি গ্রাহ্যও করেন নি। একটি টাকাও যদি কাল আপনি আমাকে দিতেন, আমি সারাপথ হেঁটে আসতুমনা, আর—সপরিবার সারারাত আমাদের অনশনে কাটত না।

অতিশয় বিস্ময়ের ভঙ্গীতে অবিনাশবাবু কহিলেন,—বলেন কি! তা এতই যদি আপনার অভাব ছিল, সে কথা ত কালই আমাকে—

বিনয়ের ভঙ্গীতে সুকুমার কহিল,—আগেই ত আপনাকে বলেছি স্যর, আমাদের ভেতরটার দিকে আপনি কোনদিন চেয়ে দেখেন নি, তাহলে মুখে কিছুই বলবার আবশ্যক হত না।

এ প্রসঙ্গ পরিত্যাগ করিয়াই সহসা অবিনাশ আতর্থী পকেট হইতে চেকবহি বাহির করিয়া কহিলেন,—দেখুন সুকুমারবাবু, আপনার কাজগুলোর বাবদে অগ্রিম পঁচিশ টাকা দেওয়া আছে, আর এখন একশো পঁচিশ টাকার একখানা চেক আমি দিচ্ছি আপনাকে, হিসেবটা সেটল্ করে নিন।

দৃঢ়স্বরে সুকুমার জানাইল,—সেট্‌ল করবার আর কিছু নেই, অবিনাশবাবু! কাল এটা পেলে আমার জীবনের চাকা আপনার চিত্রালয়কে পরিবেষ্টন ক'রেই ঘুরতো; কিন্তু ঈশ্বরের সেটা বোধ হয় অভিপ্রেত নয়! আপনিত জানেন, মিষ্টার হিউমের সঙ্গে আমি ওবেলাই সব সেটল করে এসেছি। সেখানেই অতঃপর আমার সারা জীবনের সেট্‌লমেণ্ট পাকা, এর আর নড়চড় নেই। কেন জানেন, বিদেশী হ'লেও ওরা আমাদের ভেতরটা আগেই দেখেছে, ভাতের ভাবনা মাথায় নিয়ে ওদের কাজে মাথা খেলাতে হয় না, অবিনাশ বাবু!

শুষ্ককণ্ঠে অবিনাশ আতর্থী কহিলেন,—আপনার ভাল হলে আমরাও সুখী হব; এখন আপনার পাওনাটা নিয়ে আমাকে ত রেহাই দিন।

করযোড়ে মিনতির সুরে সুকুমার কহিল—ও টাকা আমার নেওয়াই হয়েছে, অবিনাশ বাবু! আপনি ওটা আমার নামে খরচ লিখে আপনার টেবলের ড্রয়ারে রেখে দেবেন, আর আমার মতই সত্যকার অভাবগ্রস্ত কোনো শিল্পী প্রয়োজনের অনুরোধে প্রার্থী হলে তার ভেতরটা দেখে ঐ থেকে তার মুখে হাসি ফোটাবেন! একজনও এভাবে পরিতৃপ্ত হলে আমার জীবন ধন্য হবে। আপনার কাছে এই মাত্র আমার প্রার্থনা। মনে রাখবেন স্যর—আজ শারদীয়া ষষ্ঠী, এ দিনের প্রার্থনা বিফল হয় না।

দুঃখের পাঁচালী

বেকার কেরাণীর

এক

ব্যবসায় মন্দা পড়ায় সওদাগরী প্রতিষ্ঠান ক্লাইভ কোম্পানী ত আফিস তুলিয়া দিলেন, কিন্তু দশটা হইতে পাঁচটা পর্য্যন্ত কলম চালাইয়া এই প্রতিষ্ঠানটিকে যাঁহারা চলার পথে ঠেলিয়া দিতেছিলেন, এমন অপ্রত্যাশিত অঘটনে তাঁহারা যেন এক সঙ্গেই আকাশ হইতে খসিয়া পড়িলেন !

প্রায় পঞ্চাশ বৎসরের পুরাতন আফিস ; বাবুদের অনেকেই এখানে পুরুষানুক্রমে কলমবাজী-সূত্রে সুপ্রতিষ্ঠিত ছিলেন। দীর্ঘকালের সুদৃঢ় যোগসূত্র আজ এক কথায় ছিন্ন হইয়া গেল। অল্প কয়েক বৎসর হইল, এই আফিসের ডাইরেক্টর বাবুদের সুবিধার জন্য প্রভিডেণ্ড ফণ্ডের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। বর্ত্তমানে তাহা অনেকটা কার্য্যকরী হইল। ফণ্ডের পাওনা টাকা ও তাহার সহিত এক মাসের মাহিনা অতিরিক্ত দিয়া বড় সাহেব মলিনমুখে গাঢ়স্বরে বাবুদের উদ্দেশ্যে জানাইলেন,—গুডবাই !

ক্লাইভ কোম্পানীর এই আকস্মিক তিরোধানে আফিস-অঞ্চলে চাঞ্চল্য উঠিল, সহরের পাড়ায় পাড়ায় এ সম্বন্ধে কয়েকদিন রীতিমত আলোচনাও চলিল। গঙ্গাধর গাঙ্গুলী ছিলেন এখানকার বড় চাকুরে ; মাসিক প্রায় দেড় শত টাকার চাকুরী খোয়াইয়া সর্ব্বসমেত আড়াই হাজার টাকা লইয়া বাসায় যখন ফিরিলেন, তাহার আগেই পাড়া সরগরম হইয়া গিয়াছে। পাড়ার হিতৈষীদল তাঁহার দুঃখে সমবেদনা জানাইয়া কহিলেন,—কি ক্ষতিটাই

তোমার হল ভায়া! অত বড় পায়া, এতগুলো টাকা মাসকাবারে বাড়ীতে আনতে, এক দণ্ডেই সব একবারে খতম! তবু মন্দের ভাল বলতে হবে যে, অতগুলো টাকা হাতিয়ে ফিরে এলে,—মাথা খেলিয়ে এগুলো খাটাতে পারলে আখেরের একটা হিল্লে হবারই কথা।

হিতৈষীদের গভীর সমবেদনায় সুর ও সেই সঙ্গে হিতোপদেশের ঈষৎ আভাস, প্রথমদিন এই পর্য্যন্তই পাওয়া গেল। তাহার পর টাকাগুলি খাটাইবার নানারূপ পরামর্শ নানাসূত্রেই উপস্থিত হইয়া মর্ম্মাহত গঙ্গাধর গাঙ্গুলীকে অতিষ্ঠ করিয়া তুলিল।

প্রলয় মিত্তির হাতীবাগানের এক নামজাদা রেস্‌বীর। বেকার প্রতিবেশীর শেষের সম্বলটি ঘোড়ার পিছনে লাগাইয়া ঘোড়ার গতিতে বিমুখ সৌভাগ্যকে ফিরাইবার প্রচণ্ড পরামর্শ দিলেন। কহিলেন,—আড়াই হাজার যার পুঁজি, তার আবার ভাবনা কি? একটা সীজনেই ঐ পুঁজী বিশ হাজারে যদি না তুলতে পারি, তাহলে হাতীবাগান থেকে হাটখোলা পর্য্যন্ত সারা পথ নাক দিয়ে খত কেটে যাব।

প্রসাদ গুঁই এ অঞ্চলের এক জাঁদরেল নাট্য-ব্যবসায়ী। গঙ্গাধরের সৌভাগ্যই হউক আর দুর্ভাগ্যই হউক, ইনিও তাঁহার প্রতিবেশী। বার তিনেক গণেশ উল্টাইয়া এখনও তিনি টাল সামলাইতে পারেন নাই, হাল খুঁজিতেছিলেন। বক্সের একখানি পাসের সহিত তাঁহার তরফ হইতে প্রস্তাব আসিল,—টাকাটা আমার থিয়েটারে খাটুক গাঙ্গুলী, ঐটে জমা রেখে ফীমেল সীট্‌টার ভার নাও,—পাঁচ হাজার টাকা নিয়ে অ্যালেন ব্রাদার্স সাধাসাধি

করছে, তুমি হচ্ছ পাড়াপ্রতিবেশী, তাই তোমাকেই এ চান্স দিচ্ছি। এক বছরে লাল হয়ে যাবে।

বরদা বক্সী তরুণ সাহিত্যিক, গঙ্গাধরের বাসার গায়েই তাঁহার 'বাহাদুরী' পত্রিকার আফিস। বক্সী একাধারেই বাহাদুরীর সম্পাদক, স্বত্বাধিকারী, হিসাবরক্ষক, কেরাণী ও প্রুফ-রীডার ; নিজে এতগুলি ভার একা বহন করিয়াও গ্রাহক হইবার ভারটি চাপাইয়াছিলেন দেশের দশজনের উপর, সুতরাং বাহাদুরীর আর্থিক দুর্দ্দশার অন্ত নাই। কার্ত্তিকের সংখ্যাখানি মাঘ মাসের মাঝামাঝি বাহির করিয়া প্রেসের বিলের চাপে বরদা বক্সীর যখন সঙ্গীন অবস্থা, তখন তিনি উৎকর্ণ হইয়া শুনিলেন, চাকরী হারাইয়া তাঁহার প্রতিবেশী শেষের সম্বল হাজার আড়াই টাকা লইয়া ভাগ্যপরীক্ষায় বদ্ধপরিকর এবং একাধিক পরীক্ষক তাহাকে উপযুক্ত পথ বাতলাইতে উমেদারী আরম্ভ করিয়াছে। বরদাও সে সুযোগ ছাড়িতে পারিলেন না, গাঙ্গুলীকে বাহাদুরীর নূতন পুরাতন সংখ্যাগুলি উপহার দিয়া কহিলেন,—টাকাটা আপনি বাহাদুরীর সেবায় ইন্‌ভেষ্ট্ করুন, কভারের ওপরেই আমরা আপনার নাম বড় বড় হরফে পরিচালক ব'লে ছাপাবো, এক মাসেই আপনি বিখ্যাত হয়ে পড়বেন ; পরের চাকরী ত করলেন এতকাল, এবার করুন সত্যকার কাজ—বাণীর পূজা, দেশের সেবা, দশের কল্যাণ। তারপর, বাহাদুরী একবার যদি রেগুলার হয়ে যায়—ঠিক মাসে মাসে বেরোয়, তখন এর পয়সা খায় কে ?

গঙ্গাধরের তখন সসেমিরে অবস্থা ; প্রত্যেক হিতৈষীর কথাই স্থির হইয়া শুনেন এবং মৃদুকণ্ঠে বলেন,—আচ্ছা ভেবে দেখি। যা হোক একটা করতে হবে বৈকি।

কিন্তু কি যে তিনি করিবেন, কোন্ পথ ধরিয়া অগ্রসর হইবেন, তাহা বিরলে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ভাবিয়াও স্থির করিতে পারিলেন না। তিন হিতৈষীর ত্রিবিধ নির্দ্দেশ তাঁহার মর্ম্ম-স্পর্শ করিলেও, মর্ম্মের মধ্য হইতে কোনও সাড়া আসিল না।

এই সময়ে সহধর্ম্মিণী অন্নপূর্ণা দেবী চিন্তামগ্ন স্বামীর সম্মুখে আসিয়া কহিলেন,—অনেকেই ত অনেক কিছু করতে বলছে, আমার একটা কথা শুনবে?

গঙ্গাধর চমকিয়া উঠিলেন। পত্নীর মুখখানির উপর বদ্ধদৃষ্টিতে চাহিয়া কহিলেন,—সত্যি, তোমাকে ত কোন কথাই জিজ্ঞাসা করি নি,—একাই হাবুডুবু খাচ্ছি ভাবনার তুফানে পড়ে', অথচ তার অংশ নিতে যোগ্য লোকই রয়েছেন পাশে।

অন্নপূর্ণা কহিলেন,—চাকরী হারিয়ে তুমি নিজেকেই হারিয়ে ফেলেছ যে! ক'দিনেই এই অবস্থা, এর পরে কি হবে, তা ভাবতেও ভয় হয়; তাই আর চুপ করে' থাকতে পারলুম না।

গঙ্গাধর অর্থপূর্ণ নয়নে চাহিয়া প্রশ্ন করিলেন,—তুমি এখন কি করতে চাও?

অন্নপূর্ণা কহিলেন,—তোমাকে নিয়ে এখান থেকে পালাতে চাই।

—এ কথার মানে?

—মানুষের মন যখন ভেঙে যায়, তখন সেই ভাঙা জায়গাটি দিয়ে কত রকমের ভূত কত ছলেই সেখানে আনাগোনা করে। কেউ ধরিয়ে না দিলে মনের মালিক তাদের সত্যিকার রূপ জানতে পারে না। মাস গেলে দেড়শো টাকা তুমি ঘরে আনতে, এ-বাজারে

এ রকম চাকরী আর জুটবে না তা তুমি বেশ বুঝছো; কাজেই শেষের যে সম্বলটুকু হাতে আছে, তাই নিয়ে তুমি ভাগ্য ফেরাবে মনে করেছ। কিন্তু এ তোমার মস্ত ভুল,—এ পথে যদি তুমি পা বাড়াও, তা'হলে শেষে সর্ব্বস্ব খুইয়ে রাস্তায় গিয়ে দাঁড়াতে হবে।

—তা'হলে তুমি কি করতে বল? একটা উপায় ত কিছু করতে হবে। দু'বেলায় বিশখানা পাতা পড়ে, তার যোগাড় হবে কি করে? পুঁজি ভেঙে খেলেই বা চলবে কত দিন?

—কিন্তু পুঁজির ঐ টাকা কটা নিয়ে ছিনিমিনি খেললেই কি সুদিন ফিরে আস্‌বে?

—বেশ ত গো, তুমিই না হয় একটা উপায় বাতলে দাও।

অন্নপূর্ণা এবার মৃদু হাসিয়া কাহলেন,—আমার কি এমন বিদ্যাবুদ্ধি যে, এত বড় ব্যাপারে উপায় বলে' দিতে পারি? তবে একটা কথা এই, তুমি ত জানই, দুপুরবেলা কাগজ পড়া আমার একটা বাতিক। আজ আমরা যে অবস্থায় পড়েছি, সহরের বোধ হয় অর্দ্ধেক লোকের অবস্থাই এই; এ সময়ে আমাদের কি করা উচিত, এ সম্বন্ধে একখানা কাগজে ক'মাস ধরে যে সব কথা যুক্তি দিয়ে লিখ্‌ছে, আমি সেগুলো পড়েছি; এতবার পড়েছি যে মুখস্থ হয়ে গেছে; তুমি যদি ঘণ্টাখানেক সময় দাও—তোমাকে সেগুলো পড়ে' শুনাই!

গঙ্গাধর মুখখানি সহসা বিকৃত করিয়া কহিলেন,—তবেই হয়েছে? কাগজের প্রবন্ধ প'ড়ে, তা' থেকে কেউ কোন উপায় বেছে নিয়েছে, এ পর্য্যন্ত ত কখনও শুনিনি!

অন্নপূর্ণা বিদ্রূপের সুরে কথাটার উত্তর দিল,—তার কারণ,

কাগজ হাতে পেলে বেছে বেছে তারা গল্পই পড়ে, গল্পের বাইরেও যে গল্পের চেয়ে মনোরম কিছু আছে, সে সন্ধান ত তারা রাখে না। এখন আমার প্রার্থনাটুকু শোনা হোক,—ঘণ্টার পর ঘণ্টা নিষ্ফল ভাবনায় ত কাটিয়েছ, না হয় একটি ঘণ্টা এই ব্যাপারটুকুই দিলে!

গঙ্গাধর মৃদু হাসিয়া সম্মতি দিলেন,—তোমার প্রার্থনাই মঞ্জুর, আর্জি তা'হলে পেশ কর।

অন্নপূর্ণা কাপড়ের ভিতর হইতে পত্রিকাখানি বাহির করিয়া চিহ্নিত প্রবন্ধটি পড়িতে বসিল।

* * * *

প্রবন্ধ পড়া শেষ হইলে গঙ্গাধর সহসা প্রশ্ন করিলেন,—প্রবন্ধলেখকের মত তোমারও কি এই মত—সহরের সংস্পর্শ ছেড়ে আমাদের পাড়াগাঁয়ে ফিরে যাওয়া উচিত?

অন্নপূর্ণা বেশ সহজ ভাবেই উত্তর দিলেন,—এই মত যদি আমার না হবে, তা'হলে এমন যত্ন করে' কাগজখানা কাছে রাখতুম, না এত সাধ্য-সাধনা করে' এ প্রবন্ধ তোমাকে শোনাতুম?

—ভাল ক'রে সুবিধে অসুবিধের কথা সব ভেবে দেখেছ?

—মেয়েরা সেগুলো আগেই না ভেবে কিছুতেই পা বাড়াতে চায় না।

—এখানকার যে সব সুখ-সুবিধে অভ্যস্ত হয়ে গেছে, একটানা প্রায় বিশ বছর যেগুলো আমাদের আচার ব্যবহারে জড়িয়ে রয়েছে, তাদের মোহ কাটাতে পারবে? ধর, এখানে কল ঘুরুলেই পাও তোফা জল; বোতাম টিপলেই জ্ব'লে ওঠে বিজলীর আলো, একটা টাকা নিয়ে বেরুলে দোতলা বাসে চেপে

সপরিবারে ঘণ্টাখানেকের মধ্যে কালীঘাট ঘুরে আসা যায়; পথ-ঘাট, ট্রাম-বাস, বাজার, খাবার, বায়স্কোপ, থিয়েটার—এসব উপভোগ করবার এমন সুযোগ,—কস্মিন্‌কালেও তোমার পাড়া-গাঁয়ে পাবে?

অন্নপূর্ণা স্থির হইয়া স্বামীর কথাগুলি শুনিলেন, তাহার পর আস্তে আস্তে মর্ম্মস্পর্শী স্বরে কহিলেন,—বাবা চোখ বুজবার পরেই ত ভীটে ছেড়ে সহরে এসে আমরা সংসার পেতেছি। কিন্তু আখেরের কি করতে পেরেছি বলত? ভাল খেয়েচি পরেছি; আজ থিয়েটার, কাল বায়স্কোপ, পরশু চিড়িয়াখানা—এই সব সখ মিটিয়ে ভেবে এসেছি বরাবর—আমরা কি সুখী! যে টাকাগুলো বাড়ী ভাড়ার বাবদে দিয়েছি, দেশে থাকলে তাতে একখানা ইমারত তৈরী হত, যে সব টাকা বাজে খরচ করেছি—সে সব নিয়ে দেশে কত জমি-জেরাত করা যেত। আজ এমন করে ভাতের ভাবনা ভাবতে হত না। না বুঝে তখন যে পাপ করেছি, তারই প্রায়শ্চিত্ত করবার দিন এবার এসেছে! সহরের মোহ ছেড়ে পাড়াগাঁয়ের সমস্ত অসুবিধাকেই ভগবানের নির্দ্দেশ বলে মেনে নিতে হবে।

গঙ্গাধর স্তব্ধ বিস্ময়ে স্ত্রীর উৎসাহ-উজ্জ্বল মুখখানির দিকে চাহিয়া তাঁহার যুক্তিপূর্ণ কথাগুলি শুনিতেছিলেন, এবার কহিলেন,—তুমি আমি না হয় মেনে নিলুম, কিন্তু তোমার ছেলে মেয়েরা?

অন্নপূর্ণার চক্ষু দীপ্ত হইয়া উঠিল, দৃঢ়স্বরে উত্তর দিলেন,—তাদের মাথাও ত আমরা গোড়া থেকেই বিগড়ে দিয়েছি; পথ চিনে ধাপে ধাপে উঠতে দিই নি, মাথায় তুলে নাচিয়েছি বরাবর। আবার

তাদের গোড়ার দিকে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে হবে, হামাগুড়ি দেওয়া থেকে নতুন ক'রে তাদের শেখাতে হবে সব। তুমি না পার, আমিই বুঝিয়ে দেব ছেলেমেয়ে সকলকে—ভুল করে' আমরা বিপথে এসেছি, এবার ফিরতে হবে, তোমরাও ফিরে চলো।

বিস্ময়ের উপর বিস্ময়ের সঞ্চার! অভিভূতের মত গঙ্গাধর গাঢ়স্বরে কহিলেন,—এর ওপর আর কথা চলে না; এখন আমার কি মনে হচ্ছে জান?—ভগবান তোমাকেই দিয়েছেন পথের সন্ধান; এখন আমাদের কর্ত্তব্য হচ্ছে—অন্ধের মত তোমার অনুসরণ করা। সহরের আলো থেকে পল্লীর অন্ধকারেই যদি তুমি আমাদের নিয়ে যেতে চাও, তাতেও আমাদের দ্বিধা নেই।

অন্নপূর্ণা পরিপূর্ণ দৃষ্টিতে স্বামীর মুখের দিকে চাহিয়া স্নিগ্ধ কণ্ঠে কহিলেন,—যে আলোয় মানুষের মনের অন্ধকার ঘুচে যায়, সে কি শুধু সহরেই? প্রদীপের ওপরে যেমন আলো, নীচে তেমনই অন্ধকার। এখনও কি বুঝতে পারনি, সহরের এই উজ্জ্বল আলোর পেছনে কি রকম অন্ধকার গাঢ় হয়ে রয়েছে!

দুই

তিন বৎসর পরের কথা।

কলিকাতার বাহিরে, প্রায় বাইশ মাইল দূরে মউখালী মৌজা। আশে পাশে এগারোখানি গণ্ডগ্রামের সংযোগে এই প্রসিদ্ধ মৌজাটি গঠিত এবং শিয়ালদহের স্বনামধন্য ধনী চৌধুরী বাবুদের বিশাল জমিদারীর অন্তর্ভুক্ত। জমিদারের সহিত প্রজাদের সাক্ষাৎ সম্বন্ধ

কোনও দিনই নাই, জমিদারের প্রতিনিধি মউখালী কাছারীর নায়েব রামেশ্বর রায় মহাশয় জমির খাজনা ও জমিদারের সম্মান দুইটিই বরাবর অখণ্ড প্রতাপের সহিত আদায় করিয়া আসিতেছেন। প্রজার সহিত এই জমিদার-সরকারের যোগসূত্রের মূলে দেখা যায়, কিস্তী অনুসারে খাজনার টাকা মায় জলকর, পথকর, পেথেলী, হিসেবানা প্রভৃতি প্রজাপক্ষের যেমন অবশ্য দেয়, পক্ষান্তরে ক্রিয়াকর্ম্ম উপলক্ষে নির্দ্ধারিত মাথট ও মারচা খাজনার মতই অপরিহার্য্য। জমিদার-বাড়ীর পূজাপার্ব্বন বা কাজকর্ম্মে প্রজাদিগকে সহায়তা-সূত্রে 'মাথট' দিতে হয় এবং প্রজাদের পারিবারিক কাজকর্ম্মেও নজরানা-স্বরূপ মারচা দাখিল করিয়া ধন্য হইতে হয়। জমিদার-সরকারের সেরেস্তায় এবং জমিদারীর প্রজাদের জীবনযাত্রায় সুপরিচিত এই মাথট ও মারচার বাজে আদায় নৈবেদ্যের চূড়ায় জোড়া মণ্ডার মত মহালের হস্তবুদের মর্য্যাদা বাড়াইয়া দিলেও, যাহারা নির্ব্বিচারে ইহা সরবরাহ করিত, তাহাদের কোনও রূপ দায়-দফায় সহায়তায় প্রযোজন অথবা জমির উন্নতিসূত্রে আবেদন জমিদারের আগ্রহকে কোনও দিন আকর্ষণ করিতে পারে নাই। যে জমির উপসত্ব হইতে সহরবাসী জমিদারের দেশব্যাপী প্রতিষ্ঠা ও অসামান্য রাজগী, সেই জমিকেই উপেক্ষা করিয়া নাম কিনিতে দেশে বিদেশে তাঁহার দানের কি ঘটা! তাঁহার বিশাল জমিদারীর সুদীর্ঘ সদর রাস্তাটি পাকা হইবার অবকাশ পায় নাই, মউখালীর অধিবাসীরা চাঁদার খাতা খুলিয়াও ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ডের ক্ষুধা মিটাইতে পারে নাই, ঘাটতি টাকার জন্য সদরের সেরেস্তায় দরখাস্ত পাঠাইয়া প্রজাগণ যখন সাগ্রহে উত্তর প্রতীক্ষা করিতেছিল, তখন তাহারা একদিন

খবরের কাগজে পড়িল—তাহাদের দান-বীর ভূস্বামী বিন্ধ্যাচলের পাহাড়ের উপর এক সুগম রাস্তা বানাইবার জন্ম সেখানকার ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ডের হাতে সাত হাজার টাকা দান করিয়া নাম কিনিয়াছেন!—এদিকে হাজার টাকার অভাবে তাঁহার নিজের জমিদারীর রাস্তা কাঁচাই রহিয়া গেল!

জমিদার ভাবিয়াছিলেন, তাঁহার শোষণ-শকটের চাকাগুলি বাধা না পাইয়া চিরদিনই সমান গতিতে চলিবে এবং জমিদারীর প্রজাগণ নিরুত্তরে তাহার রন্ধ্রে তৈল যোগাইবে! বিশ্বব্যাপী পরিবর্ত্তনের ধারা—সর্ব্বত্রই জনসাধারণের জাগরণের জীবন্ত সাড়া, তাঁহার চিত্তে শিহরণ তুলে নাই, ইহাই আশ্চর্য্য।

সহসা একদিন চাকা বন্ধ হইয়া গেল। জমিদারের পৌত্রের অন্নপ্রাশন; সদর হইতে নায়েবের নামে হুজুরের স্বাক্ষরিত পরোয়ানা আসিল। তদনুসারে মহালের প্রজাদের নামে নায়েবের হুকুম জারী হইল—সাতদিনের মধ্যে মাথটের টাকা এবং সেই সঙ্গে কলাপাতা ও ক্ষেতের তরিতরকারী কাছারী বাড়ীতে দাখিল করা চাই।

অন্যান্য বার এই জাতীয় অনুষ্ঠানে প্রজারা পরমোৎসাহে কোমর বাঁধিয়া হুকুম তামিল করিতে ছুটিত; কিন্তু এবার কাহারও এ সম্বন্ধে কোনও সাড়া পাওয়া গেল না। নায়েব মহাশয় উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিলেন, অন্নপ্রাশনের দিন আসন্ন, অথচ এ পর্য্যন্ত কিছুই আদায় নাই।

আরও বিস্ময়ের বিষয়, পুত্রকন্যাদের বিবাহাদি সূত্রে জমিদারের প্রাপ্য মারচার টাকার আমদানীও ইদানীং সহসা বন্ধ হইয়া

গিয়াছে! অথচ, নায়েব নানাসূত্রেই জানিতে পারিয়াছেন, মহালের মধ্যে অনেকগুলি বিবাহ সম্প্রতি ভালোভাবেই সম্পন্ন হইয়াছে। কিন্তু কোনও স্থান হইতেই বিবাহের পূর্ব্বে পান-সুপারীসহ কেহই জমিদার প্রতিনিধির অনুমতি লইতে আসে নাই এবং বিবাহের পরে যথারীতি মারচার টাকাও দাখিল করে নাই। ইহা ত শুভ লক্ষণ নহে। নায়েবের ললাটে চিন্তার রেখা পড়িল, ভ্রূযুগল কুঞ্চিত হইয়া উঠিল। মারচা ও মাথটের তাগিদ দিতে গ্রামে গ্রামে পাইক ছুটিল।

কিন্তু তাহারা যে সংবাদ সংগ্রহ করিয়া ফিরিয়া আসিল, তাহা যেমন নির্ঘাত, তেমনই চমকপ্রদ। প্রজারা একবাক্যে জবাব দিয়াছে—টাকা আদায় করা ছাড়া জমিদারীর প্রজাদের সঙ্গে জমিদারের যখন আর কোনও সম্বন্ধ নাই, তখন প্রজারাও খাজনার টাকা ছাড়া আর কোন বাবদে একটি পাই-পয়সাও বাজে আদায় দিবে না।

সেই দিনই নায়েবের এক সুদীর্ঘ আর্জ্জী লইয়া সদরে কাছারীর পিয়াদা রওয়ানা হইয়া গেল, পরদিনই সদর নায়েব কতিপয় আমলা ও বরকন্দাজসহ মউখালীর কাছারীতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। —এই মহালের অধিকাংশ প্রজাই কৃষীজীবী ও নিরক্ষর, ভূস্বামীর প্রতি চিরদিনই তাহারা শ্রদ্ধাশীল, এ পর্য্যন্ত নতমস্তকে নির্ব্বিচারে তাহারা জমিদারের হুকুম আইনের মত মানিয়া আসিয়াছে; প্রবলপ্রতাশালী কুবেরতুল্য ধনী সহরবাসী জমিদারের বিরুদ্ধাচারী হইবার স্পর্দ্ধাও ইহারা কোনও দিন করে নাই; তবে, সহসা তাহারা এভাবে ঐক্যবদ্ধ হইয়া জমিদারের আদেশ অগ্রাহ্য করিল

কেন? ইহার মূলতত্ত্ব-নির্ণয়ের জন্যই সদর হইতে ঊর্দ্ধতন কর্ম্মচারীদের আগমন।

কয়েকদিন অবস্থিতি করিয়া ও মহালে মহালে ঘুরিয়া নানা-প্রকার সংবাদ লইয়া কর্ম্মচারিগণ সদরে ফিরিয়া গেলেন ও হুজুরের নিকট যে রিপোর্ট দাখিল করিলেন, তাহার মর্ম্ম এইরূপ—

গঙ্গাধর গাঙ্গুলী নামে এক ব্যক্তি কলিকাতায় থাকিয়া সাহেবের আফিসে মোটা মাহিনার চাকুরী করিত। আফিস উঠিয়া গেলে, সেই লোক মউখালী গ্রামে আসিয়া বসবাস আরম্ভ করে। এই গ্রামেই তাহার পৈতৃক ব্রহ্মোত্তর ভদ্রাসন ও কিছু জমিজমা ছিল। গ্রামে আসিয়া সেইগুলি সংস্কার করাইয়া এবং হুজুরের সরকার হইতে তিন বন্দে প্রায় পঞ্চাশ বিঘা অনাবাদী পতিত জমি ও একবন্দে একুশ বিঘা আন্দাজ এক বাজে জঙ্গল অগ্রিম কিছু সেলামী দিয়া অতি অল্পহারে মৌরসী মোকররী সর্ত্তে জমা করিয়া লয়। উক্ত পতিত জমি ও জঙ্গল বহুকাল ধরিয়া পতিত অবস্থায় থাকিয়া গ্রামের আতঙ্ক ও আবর্জ্জনা স্বরূপ হইয়াছিল। পতিত জমিতে বর্ষার জল জমিত এবং বর্ষার পর সেই জল পচিয়া চতুর্দ্দিকে দুর্গন্ধ বিস্তার করিত। পল্লীবাসীরা যত কিছু আবর্জ্জনা তাহাতেই ফেলিত ও মলমূত্র ত্যাগ করিয়া ইহার কদর্য্যতা বাড়াইয়া তুলিত। পতিত জঙ্গলটি যদিও আয়তনে খুবই বৃহৎ ছিল, কিন্তু তাহার সর্ব্বাংশ ব্যাপিয়া কণ্টকময় হেতালগুল্ম ভিন্ন অন্য কোনও গাছপালার চিহ্নও দেখা যাইত না। এই দুর্গম কাঁটাবন কাহারও কোনও উপকারে আসে নাই, বরং নানাজাতীয় বিষধর সাপের আশ্রয়স্থল হইয়া আতঙ্কের সৃষ্টি করিয়াছিল। এই

সকল জমি হইতে হুজুরের সেরেস্তায় একটি পাই-পয়সাও কোনও দিন আমদানী হয় নাই। উক্ত গঙ্গাধর গাঙ্গুলী কিছু সেলামী ও বিঘাপ্রতি খাজনার আট আনা বার্ষিক নিরিখ দিয়া যখন ঐ কয় বন্দ জমি বন্দোবস্ত করিয়া লয়, তখন মউখালীর প্রজারা তাহাকে পাগল সাব্যস্ত করিযাছিল, যাহারা হিতৈষী ছিল, তাহারা বাধা দিয়াছিল এবং হুজুরের সেরেস্তার কর্ম্মচারীরা মনে মনে লাভ খতাইয়া হাসিযাছিলেন। কিন্তু উক্ত গঙ্গাধর গাঙ্গুলী আধুনিক উন্নত প্রণালীতে উক্ত পতিত জমির সংস্কার ও বিশাল জঙ্গল পরিষ্কার করাইয়া আজ সেখানে সোণা ফলাইয়া সকলকে অবাক্ করিয়া দিযাছে।

এ অঞ্চলের প্রজারা চিরদিন গতানুগতিক প্রথায় চাষ-আবাদ করিয়া আসিয়াছে। বৎসরের পর বৎসর জমির উৎপন্ন ফশলের হার হ্রাস পাইতেছে কেন, সে সম্বন্ধে এ পর্য্যন্ত কেহ কোনও উপায় নির্দ্ধারণ করিতে পারে নাই বা চেষ্টাও পায় নাই। আকাশের দিকে তাকাইযা ও অদৃষ্টের দোহাই দিয়া তাহারা এতদিন চাষ আবাদ করিয়া আসিয়াছে। আকাশে জল না হইলে তাহারা দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া সন্তান-তুল্য শস্যগাছগুলির অকাল মৃত্যু যেমন দেখে, তেমনই অতি-বর্ষণে ক্ষেত্র পরিপ্লাবিত হইলে সেই ভাবে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে। কিন্তু উক্ত গঙ্গাধর গাঙ্গুলী বর্ত্তমানে নিজে আদর্শ হইয়া চাষীদের ভুল ভাঙিয়া দিয়াছে। পতিত জমিকে এ অঞ্চলের শ্রেষ্ঠ আবাদী জমিতে পরিণত করায় এবং কণ্টকাকীর্ণ হেতাল বন পোড়াইয়া তাহাতে নানাবিধ তরিতরকারী উৎপন্ন করিয়া লাভবান্ হওয়ায়, মহালে মহালে তাহার নাম প্রচার হইয়া

গিয়াছে ও দলে দলে চাষীরা আসিয়া তাহাকে গুরু বলিয়া মানিয়া লইয়াছে।

শুনা যাইতেছে, উক্ত গঙ্গাধর গাঙ্গুলী কৃষি-কার্য্যে যে সকল পদ্ধতি অবলম্বন করিয়াছে, তাহাতে জমির উৎপাদিকা শক্তি বাড়িয়াছে ও ফসলের প্রাচুর্য্যে প্রজাদের অবস্থা ফিরিয়াছে। বর্ত্তমানে উক্ত গঙ্গাধর গাঙ্গুলী হুজুরের তালুকের এলাকাধীন এগারোখানি গ্রামের প্রজা সকলের নেতৃস্থানীয় হইয়া সর্ব্ব-সাধারণকে সঙ্ঘবদ্ধ করিয়াছে। উপস্থিত তাহারা অনাবৃষ্টি ও অতি বৃষ্টির প্রভাব হইতে চাষের জমি রক্ষা করিবার জন্য এক বহু-ব্যয়সাধ্য কাজে হাত দিয়াছে। এক সময়ে যে বিখ্যাত খালটি নদী হইতে বাহির হইয়া হুজুরের তালুকাধীন গ্রাম গুলির পার্শ্ব দিয়া বহিয়া নদীর অপর শাখায় মিশিয়াছিল, সে খাল এখন মজিয়া গিয়াছে। সেই খালের কর এখনও প্রজারা বহন করে, কিন্তু তাহার জলের চিহ্নও তাহারা দেখিতে পায় না। সেই খালের অংশ-বিশেষ অনেকের জমির সামীল হইয়া গিয়াছে, স্থানে স্থানে তাহার উপর ক্ষেত-খামার পর্য্যন্ত উঠিয়াছে। কিন্তু গঙ্গাধর গাঙ্গুলী প্রজাদের বুঝাইয়া দিয়াছে, এ দুর্দ্দিনে মানুষের মত মাথা তুলিয়া বাঁচিয়া থাকিতে হইলে ও অজন্মার ভয় কাটাইয়া জমিকে বরাবর শস্য-শ্যামলা অবস্থায় দেখিবার সাধ থাকিলে এই মজা খাল কাটানো চাই-ই।—প্রজারা বেদ-বাক্যের মত ইহা মানিয়া লইয়াছে। হুজুরের সদর সেরেস্তায় এ সম্বন্ধে দরখাস্ত করিয়া কোনও ফল তাহারা পায় নাই। সেইজন্য তাহারা নিজেরাই এ কার্য্যে ব্রতী হইয়াছে। তাহারা স্থির করিয়াছে—খাজনা ও সেস্

ভিন্ন অন্য কোনও বাবদে একটি পয়সাও তাহারা হুজুরের সেরেস্তায় জমা দিবে না। তদন্তে ইহাও জানা গিয়াছে যে, আইনের দিক দিয়া পারিপার্শ্বিক আট-ঘাট বাঁধিয়াই এই সঙ্কল্প তাহারা দৃঢ় করিয়াছে। গঙ্গাধর গাঙ্গুলী স্বয়ং কলেক্টরের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহারও সহানুভূতি আকর্ষণ করিতে পারিয়াছে। সুতরাং এ অবস্থায় হুজুরের পক্ষ হইতে অত্যন্ত সতর্কতার সহিত প্রতীকারের পন্থা অবলম্বন করা বিধেয়।

অন্নপ্রাশনের উৎসব-মুখরিত চৌধুরীবাবুদের বিশাল প্রাসাদের উপর অস্বস্তির একটা ছায়া পড়িল। উৎসবের পর হুজুরের খাস কামরায় পরামর্শ-সভা বসিল, কর্ত্তব্য সম্বন্ধে অনেক আলোচনাই হইল। আমলাদের ইচ্ছা, মামলার বেড়াজাল ফেলিয়া মহালের মাতব্বর প্রজাগুলাকে আগে নাস্তানাবুদ করা এবং খাস দখলের অজুহাতে গঙ্গাধর গাঙ্গুলীর জমি জমার উপর হানা দেওয়া। কিন্তু জমিদার সেরেস্তার বেতনভোগী উকীল জানাইলেন, এ কার্য্যে অর্থব্যয় করিয়া প্রজাপক্ষকে হাযরাণ করা ভিন্ন কোনও লাভ নাই। ফৌজদারীর দিক্ দিয়া সুবিধা ছিল, কিন্তু প্রজারা সে পথ বাঁধিয়া ফেলিয়াছে। বিশেষতঃ, পল্লী-সংস্কারের দিকে জেলার কলেক্টারের ভারী ঝোঁক, বিভাগের কমিশনার সাহেবও এর জন্য পাগল। এক চুল এদিক্ ওদিক্ হইলেই তখন সর্ব্বনাশ। তা ছাড়া, জমি, জমা, জমিদার নিয়ে কাউন্সিলেও সে সব রেজলিউসন চলিয়াছে, এ অবস্থায় প্রজাদের সঙ্গে মিটমাট করাই ভাল। সমস্ত প্রজার সঙ্গে লড়াই কোনও জমিদারের পক্ষে কখনই খ্যাতির কথা নয়।

জমিদার দীর্ঘ-নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন,—আশ্চর্য্য, একটা লোক আমার জমিদারীতে ঢুকলো সুঁচ হয়ে, আজ সে ফাল হয়ে উঠেছে মাথা তুলে! একটা মানুষ এত বড় কাণ্ড একটা বাধিয়ে দিলে!

জমিদার চৌধুরী মহাশয়ের তরুণ পুত্রও কৌতূহলের বশবর্ত্তী হইয়া এই কামরায় আসিয়াছিলেন, তিনি সহসা বলিয়া উঠিলেন—একটা মানুষেই সব জায়গায় যা কিছু অদ্ভুত কাণ্ড বাধায়! একটা দেশবন্ধুই একদিন সারা বাঙ্গালা দেশকে ক্ষেপিয়ে তুলেছিল, একটা হিট্লার আজ গোটা জার্ম্মাণীর হয়ে সারা বিশ্বটাকে কাঁপিয়ে তুলেছে!

পুত্রের আরক্ত মুখের দিকে বক্রদৃষ্টিতে চাহিয়া চৌধুরী মহাশয় মৃদুকণ্ঠে রায় প্রকাশ করিলেন—আচ্ছা, সব ত শোনা গেল, ব্যবস্থা যা করবার পরে দেখা যাবে।

সভা-ভঙ্গ হইল। আমলারা অবাক্, এত বড় সঙ্গীন ব্যাপারে তাহাদের প্রবল প্রতাপান্বিত হুজুরকে এ ভাবে রায় প্রকাশ করিতে তাহারা এই প্রথম দেখিল।

তিন

মউখালীর শেষপ্রান্তে কাঁচা রাস্তাটির গায়েই একখানি পরিপাটি ভদ্রাসন। সরকারী বাঙলোর সম্মুখে সুবিস্তৃত খোলা হাতার মত বিশাল খামার বা অঙ্গনভূমি। তাহার একদিকে সারি সারি অনেকগুলি বিচালীর গাদা মরায়ের মত শোভা পাইতেছে। অন্তদিকে ক্ষেতের উৎপন্ন নানাবিধ কলাই স্তূপীকৃত

হইয়া রৌদ্রশুষ্ক হইতেছে। মধ্যস্থলে পরিষ্কৃত সমতল স্থান। এই স্থানে পাটা ফেলিয়া হেমন্তে ক্ষেতের ধান ঝাড়া হওয়া থাকে, কলাইগুলি শুষ্ক হইলে এই স্থলে ফেলিয়া বলদ দ্বারা পৃষ্ট করিয়া ভূষী হইতে শস্য সংগৃহীত হয়।

খামারের পরেই সুদীর্ঘ গোশালা, মাটীর দেওয়ালের উপর গোয়ালপাতায় ছাওয়া চালা। একদিকে গাভী ও অন্যদিকে বলদের স্থান। গাই ও বলদগুলির পরিচর্য্যার নানা নিদর্শন বিদ্যমান।

খামার ও গোশালা অতিক্রম করিলেই পল্লী-স্থপতির বৈশিষ্ট্য বাঙ্গালীর চিরপরিচিত আদর্শ চণ্ডীমণ্ডপটি ছবির মত চক্ষুকে চমৎকৃত করে। এক সঙ্গে দুই শত নরনারী এই বিশাল মণ্ডপের বিভিন্ন অংশে আশ্রয় গ্রহণ করিতে পারে—এমনভাবে ইহা প্রস্তুত। অথচ ইহার সহিত ইটের কোনও সংশ্রবই নাই, মাটির দেওয়াল, শালের খুঁটি, বাঁশের চালা ও তাহার উপর খড়ের স্থূল আচ্ছাদনী। ঐশ্বর্য্যের প্রভাবমুক্ত হইয়াও ইহার সুষ্ঠু সৌন্দর্য্য অপরিসীম।

চণ্ডীমণ্ডপের সম্মুখেই খোলা ময়দানে পরম সুন্দর পুষ্পোদ্যান কত রকমের ফুল ফুটিয়াছে, ফুটনোন্মুখ কত ফুল গাছের শোভা বাড়াইয়া তুলিয়াছে। চণ্ডীমণ্ডপের পরেই বসতবাটী। প্রশস্ত উঠান, উঠানের বিভিন্নদিকে কতিপয় মরাই, একদিকে রন্ধনশালা, অন্যদিকে ঢেঁকির চালা; পুরাতন আমোলের কয়েকখানি ইটের ঘর ও দরদালান, দালানের সম্মুখে সোপানসমন্বিত টানা রক বা দাওয়া। এইটি সম্প্রতি নূতন প্রস্তুত হইয়াছে ও রক্তবর্ণের সিমেণ্টের দ্বারা সুমার্জ্জিত। ঘরগুলির দ্বার ও জানালা পূর্ব্বে

ছোট ছিল, সেগুলি পরিবর্ত্তন পূর্ব্বক বড় করাইয়া লওয়া হইয়াছে, দক্ষিণ খোলা থাকায় আলো ও বাতাসের প্রচুর সমাবেশ।

বসত-বাড়ীর পশ্চাতেই সুবৃহৎ পুষ্করিণী; কাক চক্ষুর মত পরিষ্কার জল। পুষ্করিণীর তিন দিকেই ফল ও তরি-তরকারীর বাগান; নানা জাতীয় মাছের অবিরাম ক্রীড়ায় পুষ্করিণীর গভীর জল সর্ব্বদাই চঞ্চল।

গৃহপালিত গাভীর দুগ্ধ, পুষ্করিণীর মৎস্য, বাগানের টাট্‌কা তরি-তরকারী, ক্ষেতে উৎপন্ন ধান্যে প্রস্তুত পরিষ্কার ঢেঁকি ছাঁটা চাল, চাষের ডাল, ঘরের ঘৃত প্রভৃতি দুর্লভ দ্রব্যসমন্বয়ে এই ভদ্রাসনের যে ভাগ্যবান্ অধিবাসীর স্বাধীন স্বচ্ছন্দ জীবনযাত্রা চলিয়াছে, তিনিই আমাদের পূর্ব্বপরিচিত সহরবাসী ও ভূতপূর্ব্ব চাকুরীজীবী গঙ্গাধর গাঙ্গুলী।

তিন বৎসরেই তাঁহার আকৃতি ও প্রকৃতির অদ্ভুত পরিবর্ত্তন হইয়াছে। স্বাস্থ্যোজ্জ্বল সুন্দর দেহ, আনন্দ ও পরিতৃপ্তির অপূর্ব্ব বিকাশে মন নির্ম্মল ও নির্ব্বিকার। সহরের পারিপার্শ্বিক আবেষ্টনে যে অকাল বার্দ্ধক্য তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ঘুরিতেছিল, তাহার চিহ্নও আর দেখা যায় না। ছোট ছেলেরা গ্রামের স্কুলে পড়া শুনা করে। স্কুলের উপর গঙ্গাধর গাঙ্গুলীর দৃঢ় লক্ষ্য, শিক্ষকগণ ছাত্রদের সম্বন্ধে সর্ব্বদা সচেতন, পাঠ্যের সহিত কৃষি ও শিল্প এখানে শিক্ষার অন্তর্গত হইয়াছে। বড় বড় তিনটি ছেলে, শ্রীরামপুরের বয়ন বিদ্যালয়ে যোগদান করিয়াছে। গঙ্গাধর ও অন্নপূর্ণার ইচ্ছা, তাহারা কৃতবিদ্য হইয়া মউখালী গ্রামে তাঁতশালা খুলিবে, কুটীর-শিল্পের প্রতিষ্ঠা করিয়া এ অঞ্চলের অভাব যথাসাধ্য মোচন করিতে সচেষ্ট হইবে।

পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ঘরখানির ভিতর পিতলের সুদৃশ্য পিলসুজটির উপর প্রদীপের আলো জ্বলিতেছিল, গৃহে প্রস্তুত বিশুদ্ধ ধূপের ধোঁয়ায় ঘরখানি সুগন্ধে ভরপূর। পার্শ্বের ঘরে ছেলেরা পড়া লইয়া ব্যস্ত; বাহিরের চণ্ডীমণ্ডপে উপদেশ-প্রত্যাশী প্রতিবেশীর দল সমবেত হইয়া মজলিশ বসাইয়া দিয়েছে, কত প্রয়োজনীয় বিষয়ের আলোচনায় তাহারা ব্যস্ত! কিন্তু তাহার মধ্যেও সকলেই যেন পরম শ্রদ্ধেয় গাঙ্গুলী মহাশয়ের খড়মের পরিচিত শব্দটি শুনিবার জন্য উৎকর্ণ!

সুপরিচ্ছন্ন বড় ঘরখানির ভিতর প্রদীপটির সান্নিধ্যে বসিয়া স্বামি-স্ত্রীর গবেষণার অন্ত নাই। উভয়ের মিলিত মস্তিষ্ক হইতে যে সব নব নব তথ্য প্রসূত হয়, চণ্ডীমণ্ডপে সমবেত শিষ্যমণ্ডলী তাহা শুনিয়া সেই অনুসারে তাহাদের কার্য্যপদ্ধতি নির্ব্বাহ করিযা থাকে।

সে দিনের সিদ্ধান্তগুলি লিখিয়া লইয়া গাঙ্গুলী মহাশয় পত্নীর প্রতিভাপ্রদীপ্ত মুখখানির দিকে চাহিয়া বলিলেন—কলকেতার সেই দিনটির কথা আজ আমার হঠাৎ মনে পড়ে' গেল!

অন্নপূর্ণা নিরুত্তরে অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে স্বামীর মুখের দিকে চাহিলেন; তাঁহার দৃষ্টিতে প্রশ্ন ব্যক্ত হইতেছিল।

গাঙ্গুলী মহাশয় সহাস্যে কহিলেন—মনে নেই, সহরের আলো ছেড়ে, পাড়াগাঁয়ের অন্ধকারে আস্‌তে আমি দ্বিধা করেছিলুম।

স্বামীর মুখের উপর স্নিগ্ধ দৃষ্টিতে চাহিয়া অন্নপূর্ণা দেবী মৃদুস্বরে উত্তর দিলেন—মনে আছে বৈকি, আমি তখন জোর করে'ই জানিয়েছিলুম. সহরের আলোর পেছনেই জমাট হয়ে রয়েছে গাঢ় অন্ধকার!

গাঙ্গুলী মহাশয গাঢ়স্বরে কহিলেন,—তুমি সেদিন ঠিক কথাই বলেছিলে, সত্য অনুভূতির কথাই আমাকে জানিযেছিলে ; এখন বুঝতে পেরেছি আমি—আলো কোথায, সেখানে থাকলে কিছুতেই পথ খুঁজে পেতুম না কোনও দিন।

স্বামীর কথায সাধ্বী সহধর্ম্মিণীর মুখখানি উজ্জ্বল হইযা উঠিল, সঙ্গে সঙ্গে প্রদীপের শিখার দিকে হাতের একটি অঙ্গুলী তুলিযা কহিলেন,—তা'হলে এই আলোই মনে ধরল শেষকালে ?

হাসি-মুখে গাঙ্গুলী মহাশয উত্তর দিলেন—নিশ্চয়ই ; এই স্নিগ্ধ আলোর ছটায আমি প্রতি রাত্রেই তন্ময হয়ে দেখি, যেন জননী বঙ্গলক্ষ্মী তাঁর শস্যশ্যামলা সুন্দর অঞ্চলখানি ছড়িয়ে বাঙ্গালার এই পল্লী-অঞ্চল উজ্জ্বল করে দাঁড়িয়ে আছেন !

স্বামীর কথায অন্নপূর্ণা দেবীর সুন্দর মুখখানিও উজ্জ্বল হইযা উঠিল, দীর্ঘাযত দুইটি চক্ষু তুলিযা পরিপূর্ণ দৃষ্টিতে তিনি স্বামীর মুখের দিকে চাহিযা রহিলেন।

দুঃখের পাঁচালী

ভাব-বিলাসীর

এক

কর্ম্মজীবনে ভাগ্যলক্ষ্মী যতটা প্রসন্ন হইয়াছিলেন, পারিবারিক জীবনযাত্রায় গৃহলক্ষ্মী লিলি ঠিক তাহার বিপরীত হইয়াই খৃষ্টবাহনের ক্ষুদ্র সংসারটিকে অশান্তিময় করিয়া তুলিয়াছিল।

খৃষ্টবাহনের পিতা রেভারেণ্ড রে বা রায় এবং লিলির পিতা কাপ্তেন সেম্ বা সোম চুনার ফোর্টের রেজিমেণ্টের সংস্রবে চুনারের অধিবাসী হইয়া পড়িয়াছিলেন। উভয়েই বাঙ্গালী খৃষ্টান, সমবয়সী, সৌহৃদ্যও ছিল পরস্পর অকৃত্রিম। পাশাপাশি দুইখানি বাংলোয় দুই বন্ধু বাসা পাতিয়াছিলেন। সে সময় যে সকল সরকারী কর্ম্মচারী রেজিমেণ্টের সংস্রবে ওয়ারেণ হেষ্টিংসের আমোলে নির্ম্মিত প্রাসাদতুল্য বাংলোগুলিতে অধিষ্ঠিত হইয়া জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছিলেন, তাঁহাদের সুখসমৃদ্ধির সীমা ছিল না। তার পর ভারত সরকার চুনার ফোর্টকে যুক্তপ্রদেশের বালক-অপরাধীদের চরিত্র-শোধনালয়ে পরিণত করিয়া, সামরিক শক্তিসম্ভার ও রেজিমেণ্ট উঠাইয়া লইয়া যান। অধিকাংশ অফিসারকে বাধ্য হইয়া পেন্‌সন্ লইতে হয়। চুনারের স্বাস্থ্য, জলবায়ু এবং স্বল্পব্যয়ে আহার্য্যের প্রচুর উপাদান সংগ্রহের সুযোগ, এই শ্রেণীর অফিসারদের এতই প্রলুব্ধ করিয়া তুলিয়াছিল যে, তাঁহারা পেন্‌সন প্রাপ্ত

হইয়া এই স্থানেই কায়েমীভাবে ঘর-সংসার পাতিয়া চুনারের ‘বাসিন্দা’ হইয়া পড়েন।

দুর্গের মধ্যে সেনাবারিকে সেনাদল থাকিলেও, বাহিরে, দুর্গের পাদদেশ হইতে লোয়ার লাইন পর্য্যন্ত সমস্ত স্থানেই শতাধিক বাংলোয় রেজিমেণ্টের অফিসারগণ বসবাস করিতেন। রেজিমেণ্ট তুলিয়া লইবার পরেই সরকার বাংলোগুলি নীলামে বিক্রয় করিয়া দিলেন। স্থানীয় অর্থশালী মহাজনরাই অধিকাংশ বাংলো ক্রয় করেন। তবে পেন্‌সনারদের মধ্যে যাঁহাদের হাতে অর্থ ছিল, তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ এ সুযোগ পরিত্যাগ করেন নাই।

রেভারেণ্ড রায় অত্যন্ত মিতব্যয়ী ও সঞ্চয়ী ছিলেন। তিনি জোড়া হাতা-সমম্বিত একখানি দুই মহলের বড় বাংলো ক্রয় করিলেন। কাপ্তেন সোম মোটা মাহিনা পাইলেও, কিছুই সঞ্চয় করিতে পারেন নাই, তিনি বন্ধু রায়ের ক্রীত বাংলোর একাংশ সুবিধায় ভাড়া করিয়া কন্যা লিলিকে লইয়া উঠিলেন।

রেভারেণ্ড রায় ছিলেন যেমন মিতব্যয়ী ও সঞ্চয়ী, তাঁহার স্ত্রী অনুপমাও ছিলেন তেমনই আদর্শ গৃহিণী। একমাত্র পুত্র খৃষ্টবাহনও সেই আদর্শে গঠিত হইয়াছিল। উপায়ক্ষম গৃহস্বামী মিতব্যয়ী এবং সহধর্ম্মিণী সুগৃহিণী হইলে সে সংসারে যেমন বিশৃঙ্খলা আসে না, অভাবও কখনও আত্মপ্রকাশ করিবার অবকাশ পায় না। ফলে রেভারেণ্ড রায় কর্ম্ম হইতে অবসর পাইয়াও সুব্যবস্থায় ও অধ্যবসায়ের ফলে শীঘ্রই আয় বাড়াইয়া ফেলিলেন। কতিপয় পাথরের ‘কোয়ারী’ ইজারা লইয়া অল্প দিনের মধ্যেই তাহাতে লাভবান্ হইয়া উঠিলেন। পূর্ব্ব হইতেই তিনি পুত্র খৃষ্টবাহনকে

কোয়ারীর কার্য্যে বিশেষজ্ঞগণের তত্ত্বাবধানে শিক্ষাধীন রাখিয়াছিলেন। যথাসময় শিক্ষাপটু পুত্রকেও এই প্রচুর লাভজনক প্রতিষ্ঠানে নিয়োজিত করিলেন। আয় প্রচুর হইলেও, তাঁহার ক্ষুদ্র সংসারে ব্যয়ের পরিমাণ এমন পরিমিত ছিল যে, তাহা বাহ্যাড়ম্বরজনক না হইলেও, জীবনযাত্রার পক্ষে যেগুলি অপরিহার্য্য ও স্বাস্থ্যপ্রদ, তাহার কোন অসদ্ভাবই ছিল না।

পক্ষান্তরে, কাপ্তেন সোম মাসিক পাঁচ শত টাকা পেন্‌সন পাইয়াও প্রায় প্রতি মাসের শেষভাগে অভাবগ্রস্ত হইতেন। সময় সময় তাঁহাকে বন্ধু রায়ের নিকটও হাত পাতিতে হইত। কাপ্তেন সোম ছিলেন বিপত্নীক,—সংসারে তাঁহার সুগৃহিণী বা সুপরিচালিকা কেহ না থাকায়, খরচের কোন বাঁধাধরা নিয়মও তাঁহার ছিল না। পেন্‌সনের টাকা হাতে আসিবামাত্র পিতাপুত্রী উভয়েই এমন বিশৃঙ্খলভাবে খরচের ঘটা আরম্ভ করিতেন যে, লোয়ার লাইনের সর্ব্বসাধারণ এ জন্য কাপ্তেন সোমকে 'নবাব সাহেব' বলিয়া অভিহিত করিতেন। পিতা ও পুত্রীকে লইয়া সংসার হইলেও, পোষ্য ছিল একটি পাল! তাহাদের মধ্যে খানসামা, খিৎমদ্দার, বাবুর্চ্চি, আয়া, হাঁস, মুর্গী, ময়ূর, পাখী, কুকুর, বিড়াল, হরিণ, খরগোস প্রভৃতি কিছুরই অপ্রতুল ছিল না!

ভবিতব্যের বিধানে, অনুপমার অনিচ্ছাসত্ত্বেও, খৃষ্টবাহনের সহিত লিলির বিবাহ যথারীতি সম্পন্ন হইয়া গেল। যখন এই বিবাহের প্রস্তাব উঠে, অনুপমা তখনই আপত্তি করিয়া বলিয়াছিলেন—"লিলিকে বিয়ে করলে খৃষ্ট কি সুখী হবে? আমার ত তা মনে মনে হয় না। খৃষ্ট আমাদের যেমন শান্ত

সৎ ছেলে, লিলি যে ঠিক তার বিপরীত। শুধু রূপ থাকলে কি হবে ?”

রেভারেণ্ড রায় পত্নী অনুপমার কথায় হাসিয়া বলিয়াছিলেন, “বরাবর বাপের আদরে মানুষ হয়েছে। মায়ের আদর বা শাসন কখন পায়নি ত। আমার খুব বিশ্বাস আছে, তোমার কাছে এলে, লিলির বাপের মত খামখেয়ালী স্বভাব বা যে দোষগুলি ওর আছে, সে সমস্তই চ'লে যাবে, তুমি ওকে নিজের মনের মতন ক'রে চালিয়ে নিতে পারবে বলেই—আমি এ বিবাহে মত দিয়েছি।”

কিন্তু অদৃষ্টের চক্রে, অনুপমার হাতে পড়িয়া লিলির উচ্ছৃঙ্খল প্রকৃতি পরিবর্ত্তিত হওয়ার আর অবকাশ পাইল না। শুভ বিবাহের ঠিক একুশ দিন পরেই লোয়ার লাহনে অকস্মাৎ বিসূচিকা এরূপ করালমূর্ত্তিতে আত্মপ্রকাশ করিল যে, তাহার প্রকোপে পাঁচটি দিনের মধ্যেই অনুপমা, রেভারেণ্ড রায় ও কাপ্তেন সোম ইহলোকের অসমাপ্ত সাধে ইস্তফা দিয়া পরলোকের পথে মহাপ্রস্থান করিলেন।

দুই

খৃষ্টবাহনের মাতা অনুপমা যে ভয় করিয়াছিলেন, তাহাই ফলিয়া গেল। খৃষ্টবাহন লিলিকে পাইয়া সুখী হইতে পারিল না। রেভারেণ্ড রায়ের মৃত্যুর পর পাঁচটি বৎসর কাটিয়া গিয়াছে। এই পাঁচ বৎসরে খৃষ্টবাহন পরিশ্রম ও অধ্যবসায়ের ফলে ব্যবসায়ের প্রভূত উন্নতিসাধন করিলেও, স্ত্রীর সাহচর্য্য কি কর্ম্মজীবন বা গার্হস্থ্য-জীবন—কোনটিতেই পায় নাই।

লিলির উচ্ছৃঙ্খল প্রকৃতি কিছুতেই সংযত হয় নাই। সে চায়—তাহার স্বামী চুনারের মত অনাড়ম্বর স্থান পরিত্যাগ করিয়া লক্ষ্ণৌ বা কলিকাতায় গিয়া সংসার পাতে; অর্থ কি শুধু সঞ্চয়ের জন্যই? কিন্তু খৃষ্টবাহন পত্নীর সুখস্বাচ্ছন্দ্যের দিকে যতদূর সম্ভব লক্ষ্য রাখিলেও, তাহার খামখেয়ালী বা চিত্তের উচ্ছৃঙ্খলতার পোষকতা কখনই করে নাই। সুতরাং লিলির উচ্চাকাঙ্ক্ষা ইন্ধনের অভাবে স্বভাবতঃ প্রশমিত হইয়া যাইত।

খৃষ্টবাহনের আর্থিক আয় যথেষ্ট থাকিলেও, লিলির পিতার মত সে তাহার ক্ষুদ্র সংসারটিকে অনাবশ্যক আড়ম্বরে ভারাক্রান্ত করিবার অবকাশ প্রদান করে নাই। লিলির পিতার আমোলেরই এক আয়াকে সে আশ্রয় দিয়াছিল এবং সেই মহিলাটিই পাক-শালার ভার গ্রহণ করিয়াছিল। খৃষ্টবাহনের ইচ্ছা ছিল, তাহার গুণবতী জননীর মত লিলিও স্বহস্তে নানাবিধ খাদ্যসামগ্রী প্রস্তুত করিয়া তাহাদের পারিবারিক আদর্শ অক্ষুণ্ণ রাখে। কিন্তু এ সম্বন্ধে লিলিকে নিতান্ত উদাসীন দেখিয়া সে আর দ্বিতীয়বার অনুরোধ করে নাই। সংসারে লিলির তিনটিমাত্র কাজ ছিল,—দিবানিদ্রা, নভেল পড়া আর কারণে অকারণে স্বামীর সহিত কলহ। তবে খৃষ্টবাহন লিলির প্রকৃতির পরিচয় পাইয়াছিল, সুতরাং ইদানীং আর সে লিলির কথা একান্ত অনুচিত ও অনাকাঙ্ক্ষণীয় হইলেও, কোন প্রতিবাদই করিত না এবং তাহার এই উপেক্ষাই লিলির মনে যেমন প্রচণ্ড ক্রোধের সৃষ্টি করিত, তাহার স্পর্ধাও তেমনই উত্তরোত্তর বাড়াইয়া দিত।

বাংলোর যে অংশ লিলির পিতা স্বতন্ত্র ভাড়া লইয়া থাকিতেন,

তাঁহার মৃত্যুর পর সেই অংশটি অনেক দিন খালি পড়িয়াই ছিল। সম্প্রতি তাহা সুসংস্কৃত করিয়া খৃষ্টবাহন ভাড়া দিবার সঙ্কল্প করিল। সংবাদপত্রে এই বাংলো ভাড়া দিবার বিজ্ঞাপনও বাহির হইল।

মাসখানেকের মধ্যেই ভাড়াটিয়া জুটিয়া গেল। আনন্দমোহন দে নামে এক বাঙ্গালী খৃষ্টান বায়ুপরিবর্ত্তনের জন্য এই বাংলো ভাড়া লইয়াছিল। এক দিন প্রত্যুষে এই নূতন ভাড়াটিয়া সস্ত্রীক বাংলোয় আসিয়া উপস্থিত হইল। খৃষ্টবাহন নিজে উপস্থিত থাকিয়া তাহাদের ব্যবস্থাদি করিয়া দিয়া স্ত্রীকে কহিল, "আমি ত কারখানায় চল্লোছি, তুমি ওঁদের একটু দেখা-শুনা ক'র, নূতন এসেছেন, যেন অসুবিধায় না পড়েন। আর তুমিও একটি বেশ সঙ্গিনী পেলে, মিসেস দে তোমারই সমবয়সী।"

ফলতঃ মিসেস দেকে দেখিবার কৌতূহল লিলির খুবই প্রবলই হইল। কলিকাতার মেয়ে না জানি কত আধুনিকাই হইবে, আর তাহারই আদর্শে সে তাহার স্বামীকে সভ্যতার দিক দিয়া আধুনিক জীবনযাত্রার গতি কোন্ পথে চলিয়াছে—তাহা দেখাইয়া দিবারও হয় ত সুযোগ পাইবে।—কলিকাতা হইতে পাঁচ শত মাইল তফাতে চুনারের মত পার্ব্বত্যপ্রদেশ এখনও যে কতটা পশ্চাতে পড়িয়া আছে, পাথরের ব্যবসায়ে প্রমত্ত সৌন্দর্য্য দৃষ্টিহীন স্বামী তাহার সন্ধান না পাইলেও, নভেল ও ম্যাগাজিনের সহায়তায় সে ত তাহার পরিচয় পাইতেছে! প্রত্যক্ষ আদর্শ দেখাইয়া যদি এখন এই অপদার্থ স্বামীর ভ্রম দূর করা যায়, মন্দ কি?

পাশের বাংলোর দরদালানে পা দিয়াই লিলি দেখিতে পাইল, তাহারই সমবয়সী এক স্বাস্থ্যবতী সুন্দরী তরুণী বস্ত্রাঞ্চল কোমরে

জড়াইয়া পরম উৎসাহের সহিত বাংলোর ভোজনঘর ভিজা কাপড় দিয়া ধোওয়া-মোছা করিতেছে ও হাফ প্যাণ্ট-পরা কৃষ্ণকায় এক বালক ছোট একটি বালতি করিয়া জল ঢালিয়া দিতেছে।

লিলির সহিত চোখোচোখি হইবামাত্র মেয়েটি কায করিতে করিতেই জিজ্ঞাসা করিল, "আপনি ?"

লিলি কহিল, "আমি পাশের বাংলো থেকে আসছি —"

মেয়েটি সহজভাবেই কহিল, "ওঃ, বুঝেছি, আপনিই তা হ'লে মিসেস রায় ; ধন্যবাদ। আপনাকে দেখে বড় আনন্দ পাচ্ছি, আমরা আপনারই আশ্রয়ে এসেছি। কিন্তু দেখছেন ত আমার অবস্থা, আপনাকে হাত তুলে নমস্কার করার সৌভাগ্যও পেলুম না, —খোদন, যা ত বাবা—একখানা খুরসী ও ঘর থেকে—"

বাধা দিয়া লিলি বলিল, "না, না, খুরসী আনতে হবে না তোমাকে ; আমার বসবারও এখন অবসর নেই। তিনি ব'লে গেলেন কি না, তাই আপনাদের খোঁজ-খবরটি একবার নিতে এসেছি। আপনিই তা হ'লে—"

লিলির জিজ্ঞাসা করিতেও বাধিতেছিল যে, এই কদর্য্য কার্য্যে প্রবৃত্তা মেয়েটি যথার্থই এ বাড়ীর গৃহিণী কি না ? বুদ্ধিমতী মেয়েটি তাহার সেই সঙ্কোচপূর্ণ সংশয়টুকু অনুমান করিয়াই হাসি মুখে কহিল, "হাঁ, আমিই মিসেস দে।"

অতি কষ্টে আত্মদমন করিয়া লিলি কহিল, "আপনাদের চিঠি পেয়েই ঘরগুলো সবই ধুয়ে রাখা হয়েছিল, তবু আপনি এসেই আবার এ সব করছেন কেন ?"

মেয়েটি হাসিয়া উত্তর দিল, "আপনারা দয়া ক'রে সে সব ক'রে

রেখেছেন, তা জানি, কিন্তু তবুও ঘরদোর না ধুলে গা যেন ঘিন্-ঘিন্ করে, বিশেষ, পশ্চিমের যে ধুলো, আপনারা ত দুটি বেলায় তার পরিচয় পান। তাই আর এক দফা প্রসাধনপর্ব্ব সুরু করেছি। -কিন্তু আপনি দাঁড়িয়ে থাকবেন, সেটা কি ভাল দেখায় ?"

এই সময় পাশের ঘরের দরজা খুলিয়া মেয়েটির স্বামী অকুস্থলে আসিয়া উপস্থিত হইল। ভিতর হইতেই জানালার ফাঁক দিয়া সে সমস্তই দেখিতেছিল। শিষ্টাচার রক্ষার জন্য এখন আত্মপ্রকাশ করিয়া বলিল, "আমিও সসম্ভ্রমে আপনাকে আমার নমস্কার জানাচ্ছি, মিসেস রায়! আমরা আপনাদেরই আশ্রয়ে এসে পড়েছি। আপনার স্বামী প্রাথমিক যা কিছু সাহায্য করবার সবই করেছেন, আপনিও দয়া ক'রে দেখা শুনা করতে এসেছেন দেখছি। কিন্তু এ ভাবে দাঁড়িয়ে থাকলে আমাদের মনে লজ্জা দেওয়া হবে, অন্ততঃ কিছুক্ষণের জন্যও ও ঘরে এসে বসুন, আমরা আশ্রিত, পর মনে করবেন না যেন।"

লিলি মুগ্ধনেত্রে এই বাক্‌পটু যুবাটির দিকে চাহিয়া রহিল। গৃহিণীকে দেখিয়া তাহার মনে যে বিদ্রোহ উপস্থিত হইয়াছিল, তাহার স্বামীর কেতাদুরস্ত হাবভাব, ফিটফাট চেহারা ও কথা কহিবার অভিনব কৌশলে সে বিসদৃশ ভাব কাটিয়া গেল, দেহের সমস্ত রক্ত নিমেষের মধ্যে তাহার মুখের উপর উঠিয়া সেই সুন্দর মুখখানিকে রাঙাইয়া দিল। গাঢস্বরে লিলি প্রশ্ন করিল, "আপনিই তা হ'লে মিষ্টার দে ?"

মিষ্টার দে উত্তর দিল, "আগেই আপনাকে জানিয়েছি, আমরা

আপনার আশ্রিত।—এঁর গৃহকর্ম্ম শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত দয়া ক'রে এই ঘরে এসে বসুন—আশ্রিতের এই আর্জ্জী।"

সে আর্জ্জী অস্বীকার করে, এমন সাধ্য লিলির ছিল না। সে স্মিতবদনে আনন্দমোহনের সঙ্গে পার্শ্বের ঘরে প্রবেশ করিল। আনন্দমোহনের স্ত্রীর চক্ষু সে দিকে মুহূর্ত্তের জন্য আকৃষ্ট হইয়াই অবনমিত হইল।

তিন

ঘণ্টাখানেক আলাপের পর সেদিন এই নবাগত দম্পতি সম্বন্ধে বহু অভিজ্ঞতা লইয়াই লিলি নিজের বাংলোয় ফিরিয়া আসিল। আনন্দমোহনের সহিত আলাপ করিয়া তাহার মন আনন্দে এমন ভরপূর হইয়াছিল,—জীবনে সে যাহা কখনও উপভোগ করিবার সুযোগ পায় নাই। পক্ষান্তরে, আনন্দমোহনের মুখে তাহার পত্নী শোভার সর্ব্বান্ত পরিশ্রম, সাংসারিক সমস্ত কার্য্য—এমন কি রন্ধনাদি পর্য্যন্ত সে নিজেই সম্পন্ন করে এবং এই সকল লইয়াই সে ব্যস্ত—আনন্দমোহনের সহিত বিশ্রম্ভালাপ বা আমোদ প্রমোদে যোগদানের অবসর বা স্পৃহা তাহার মোটেই নাই,—এই সমস্ত শুনিয়া সে ভাবিয়াছিল,—এমন আনন্দময় স্বামীর কি দুর্ভাগ্য।

সেই দিনই এই নূতন ভাড়াটিয়াদের কথাপ্রসঙ্গে লিলি খৃষ্ট বাহনকে বলিয়াছিল,—"মিঃ দে চমৎকার লোক,—এমন সুন্দর প্রকৃতির মানুষ সচরাচর দেখা যায় না,—সর্ব্বক্ষণই আনন্দ আর হাসি নিয়েই থাকেন। আর দুনিয়ার এত খবরও রাখেন!"

খৃষ্টবাহন উত্তরে বলিয়াছিল,—"ওঁর স্ত্রীর প্রকৃতি কিন্তু আরও সুন্দর! ঘড়ির কাঁটা ধ'রে কায করেন,—নিজের হাতে সমস্ত তৈরী ক'রে কাঁটায় কাঁটায় খাবার ব্যবস্থা,—হোটেলকেও হারিয়ে দিয়েছেন। আর শিল্প-কাযও যে কত রকমের জানেন—বৈঠকখানা-ঘরে গিয়ে বসলেই তার পরিচয় পাওয়া যায়!"

শুনিয়া লিলি স্তব্ধ হইয়া গুমরাইতে লাগিল! আর কোন কথা কহিল না।

অল্পদিনের মধ্যেই আনন্দমোহনের সহিত লিলির ঘনিষ্ঠতা খুবই গাঢ় হইয়া পড়িল। অথচ আনন্দমোহনের স্ত্রী শোভার সহিত তাহার মোটেই বনিবনাও হইল না। শোভার মনটিকে দূষিত করিবার অভিপ্রায়ে সে যখন তাহার গৃহকর্ম্মে অক্লান্ত পরিশ্রমের দোষ ধরিয়া নিন্দা করিত, শোভা তখন গম্ভীর হইয়া উত্তর দিত,—"মেমদের ধর্ম্ম আমাদেরই ধর্ম্ম ব'লে আচার-ব্যবহারেও যে আমাদের মেম-সাহেব হতে হবে, তার কোন মানে নেই। আমরা বাঙালীর মেয়ে, বাঙালীই থাক্‌ব। আমাদের সুখ-দুঃখ আমোদ-উৎসব কর্ম্ম-কর্ত্তব্য গৃহের মধ্যে, গৃহের বাইরে নয়। সুগৃহিণী হব, এই আমাদের শ্রেষ্ঠ কামনা হওয়া উচিত। সুতরাং গৃহের কায-কর্ম্ম করা নিন্দার নয়, আনন্দের, আর তা গৌরবের বিষয়!"

লিলি এই সব কথা শুনিলে আরও জ্বলিয়া উঠে, কিন্তু প্রতিবাদ করিবার মত যুক্তি সে নির্ণয় করিতে পারে না; জোর করিয়া যাহা বলে, শোভার হাসিমাখা অকাট্য উক্তিতে তাহা পাগলের প্রলাপের মত ভাসিয়া যায়। কাযেই সে আর শোভার সংস্রবে না আসিয়া তাহার স্বামী আনন্দমোহনের সাহচর্য্যই অধিক পছন্দ করে এবং

তাহাতেই সে তৃপ্তি পায়। আর আনন্দমোহন,—সেও ভাবে, বায়ুপরিবর্ত্তনে আসিয়া তাহার যে এমন অবসর-সঙ্গিনী মিলিয়া যাইবে, তাহা সে কল্পনাও করে নাই;—ঈশ্বরের অপার মহিমা, তাই যে যাহা কামনা করে, তাহাই তাহার অদৃষ্টে মিলিয়া যায়।

আনন্দমোহন ধনীর পুত্র হইলেও, সঙ্গদোষে পড়িয়া সমস্তই হারাইয়াছিল। পৈতৃক সম্পত্তির মধ্যে বাড়ীখানি মাত্র যখন অবশিষ্ট আছে দেখা গেল, তখন তাহার স্ত্রী শোভা স্বামীর খাম-খেয়ালীকে আর প্রশ্রয় না দিয়া নিজেই জোর করিয়া স্বহস্তে সংসারের সকল ভার গ্রহণ করিল। ঋণের দায়ে মুহ্যমান স্বামী তখন বাধ্য হইয়া পত্নীর ব্যবস্থামত চলিতে সম্মত হয়। শোভা বাড়ীখানির অধিকাংশ ভাড়া দিয়া, ভাড়ার টাকায় ঋণ পরিশোধের একটা বাঁধাবাঁধি ব্যবস্থা করিয়া স্বামীকে নিশ্চিন্ত করিল। শোভা ধনীর কন্যা, তাহার পিতা একজন স্বনামখ্যাত ব্যবসায়ী। শোভাকে তিনি প্রতি মাসে যে হাত-খরচ দিতেন, শোভার সুবন্দোবস্তে তাহাতেই তাহাদের সংসার স্বচ্ছলভাবে চলিয়া যাইত। কিন্তু শোভা যেমন সংসারকে সুনিয়ন্ত্রিত করিয়া লইল, আনন্দ-মোহনের আনন্দভোগের সুপ্তস্পৃহা আবার জাগরিত হইয়া উঠিল,—সঙ্গিগণ আবার তাহাকে প্রলুব্ধ করিয়া তুলিল। বুদ্ধিমতী শোভা অবস্থা বুঝিয়া, সহসা চুনারে বায়ুপরিবর্ত্তনের প্রস্তাব করিল। উচ্ছৃঙ্খলস্বভাব স্বামীকে দীর্ঘকালের জন্য কলিকাতা হইতে সরাইয়া লইবার জন্যই সে এই সঙ্কল্প করিয়াছিল। আনন্দমোহন সহজেই সম্মত হইল। বাড়ীর একটি ঘরে নিজেদের জিনিসপত্র রাখিয়া

সমস্ত বাড়ী শোভা ভাড়া দিল। চুনারে তাঁহাদের সঙ্গে কেবল খোদন নামে একটি বালক-ভৃত্য আসিয়াছিল।

চুনারে আসিয়াই শোভা লিলির ভাবভঙ্গী দেখিয়া মনে মনে শিহরিয়া উঠিল। তাহার চঞ্চলপ্রকৃতি স্বামীকে যে সকল প্রলোভন হইতে সে এত দূরে লইয়া আসিল, সেই সব এখানেও? ক্রমে নানা প্রসঙ্গে শোভা বুঝিয়াছিল যে, লিলি তাহার স্বামীর প্রতি মোটেই অনুরাগিণী নহে এবং আনন্দমোহনের কথার চাতুরী এই বুদ্ধিহীনা তরুণীকে এমন আকৃষ্ট করিয়াছে যে, সে তাহাকে এক অনন্যসাধারণ অতিমানবরূপে বরণ করিয়া লইয়াছে।

শোভা যেমন বুদ্ধিমতী, তাহার মনের ধৈর্য্যও ছিল সেইরূপ অসাধারণ। সহসা কেলেঙ্কারীর ভয়ে কোনরূপ অপ্রীতিকর উপায় অবলম্বন না করিয়া সে তাহার স্বামীর উপর খর লক্ষ্য রাখিয়া চলিল। যাবতীয় সাংসারিক কার্য্যের মধ্যেও স্বামিসাহচর্য্য তাহার ইদানীং এমন সুলভ হইয়া উঠিল যে, আনন্দমোহন তাহাতে পদে পদেই বিব্রত হইতেছিল। হয় ত লিলিদের বাংলোয় গিয়া, লিলির স্বামীর অনুপস্থিতিতেই হাস্য-পরিহাসে দুজনেই প্রমত্ত, এমন সময় শোভা তাহাদের ঠিক পশ্চাতে আসিয়া—হাসিখুসির নিতান্ত বাড়াবাড়ির সময়টিই সহজস্বরে বলে,—'খাবার দেওয়া হয়েছে, খাবে চল।' উভয়েই যুগপৎ চমকিত হইয়া উঠে,—শোভার চক্ষুর দিকে চাহিবারও সামর্থ্যটুকু তাহাদের থাকে না। বিনা প্রতিবাদে সুশীল ছেলেটির মত আনন্দমোহন নিজের বাংলোয় চলিয়া আসে। বাংলোর বাগানে বসিয়া দুজনেই আনন্দে অভিভূত,—কথা আর ফুরায় না; লিলি আবেগভরে বলে,—"তোমার কথা আমার এত

মিষ্টি লাগে—" ঠিক সেই সময় হয় ত শোভা আসিয়া বলিয়া উঠে,—"মিষ্টি কথায় ত পেট ভরবেনা ভাই, তার জন্য খাবার দরকার হয় যে।" তাহার পর স্বামীর দিকে চাহিয়া বলে,—"তোমার চা আর জলখাবার এখানেই আনব কি?" উভয়েই স্তম্ভিত হইয়া ভাবে—এ কি! আনন্দমোহন বিনা বাক্যব্যয়ে শোভার সহিত চলিয়া যায়। লিলি লজ্জায় যেন মাটীর সহিত মিশিয়া পড়ে।—এই ভাবে প্রত্যহই তাহাদের লুকোচুরি অপ্রত্যাশিতভাবে প্রকাশ করিয়া দিয়া শোভা উভয়কেই বিব্রত করিয়া তুলিতে লাগিল।

কিন্তু ইহাতেও লিলি বা আনন্দমোহন কাহারও চৈতন্য হইল না। পূর্ব্বাহ্ন সকালে চা ও জলযোগ সারিয়া পাহাড়ে যাইত, দ্বিপ্রহরে সেখান হইতে ফিরিয়া আহারাদি করিত,—আবার অপরাহ্ণে আফিসে গিয়া রাত্রি নয়টা দশটার সময় বাড়ী ফিরিত। লিলি ও আনন্দমোহনের মাখামাখি ঘনিষ্ঠতার কথা তাহার শ্রুতি স্পর্শ করিত না। একটি মাস এই ভাবে কাটিয়া গেল।

চার

প্রত্যহই লিলিদের বাংলোয় গিয়া লিলির ঘর হইতে তাহার স্বামীকে আহারের সময় ডাকিয়া আনা শোভার দৈনন্দিন কার্য্যের অন্তর্গত হইয়া পড়িয়াছিল। সেদিনও আহারাদি প্রস্তুত করিয়া ও বাংলোয় স্বামীকে ডাকিতে গিয়া—বাংলোর বৃদ্ধা আয়ার নিকট শুনিল—তাহার স্বামী ও লিলি সকালের ট্রেণে মির্জ্জাপুর গিয়াছে।

আযাটি তখন জ্বরে ধুঁকিতেছিল,—বালিসের তলা হইতে একখানি পত্র সে শোভার হাতে দিল। শোভা দেখল, তাহার স্বামী লিখিয়াছেন,—'বিশেষ দরকারে মির্জ্জাপুর চলেছি, সন্ধ্যায় ফিরব ; এ বেলা আর আমার খাবার ব্যবস্থা ক'র না।'

শোভা আযাকে জিজ্ঞাসা করিল, "কখন্ এ চিঠি তোমাকে দিয়াছিলেন তিনি ?"

আয়া হাঁফাইতে হাঁফাইতে কহিল, "সকালেই দিযেছিলেন মা, কিন্তু জ্বরের যাতনায উঠতে পারি নি। লিলিকে যেতে বারণ করেছিলুম, কিন্তু সে শুনলে না,—রান্নাবান্না কিছুই হয় নি,—ছেলে এসে যে কি খাবেন—" জ্বরের যন্ত্রণায বৃদ্ধা আর বলিতে পারিল না, ছটফট করিতে লাগিল।

শোভা কহিল, "আমার খাবার-দাবার সব তৈরী হযে গেছে, মিষ্টার রায় এলে আমার নাম ক'রে বলো যে, তিনি আজ আমাদের বাংলোয় খাওয়া-দাওয়া করলে বড়ই খুসী হব। তিনি এলেই পাঠিযে দেবে, আর তোমার জন্য সাগু তৈরী ক'রে পাঠিযে দিচ্ছি।"

বাংলোয় আসিয়া সর্ব্বাগ্রে শোভা বৃদ্ধার জন্য সাগু তৈযারী করিয়া খোদনকে দিয়া পাঠাইয়া দিল। তাহার পর নিজের কাজে লিপ্ত হইয়া পড়িল। স্বামিসংক্রান্ত অমন অপ্রীতিকর সংবাদটি তাহার মনের মধ্যে কোনরূপ বিদ্রোহ উপস্থিত করিতেছিল কি না, তাহার কার্য্যে, ব্যবহারে বা তাহার প্রতিভাসমুজ্জ্বল নির্ম্মল মুখখানির দিকে চাহিলে তাহা বুঝিতে পারা যায় না।

খৃষ্টবাহন বাংলোয় ফিরিলে শোভা খোদনকে পাঠাইয়া তাহাকে আসিবার অনুরোধ জানাইল। সঙ্কুচিতভাবে খৃষ্টবাহন ভোজনগৃহে

প্রবেশ করিল। শোভার সহিত তাহার এই প্রথম সম্ভাষণ। লজ্জানম্রভাবে শোভা পরম শ্রদ্ধার সহিত খৃষ্টবাহনকে পরিবেষণ করিতে লাগিল। শোভার বিনয়নম্র ব্যবহার ও তাহার স্বহস্তে প্রস্তুত বিবিধ উপাদেয় অন্নব্যঞ্জনের আস্বাদ দীর্ঘকাল পরে খৃষ্টবাহনের চিত্তে এমন একটা তৃপ্তির সঞ্চার করিয়া দিল যে, সে সকল সঙ্কোচ কাটাইয়া উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে "দেখুন, ঈশ্বরের এমনই মহিমা, বাড়ীতে আমার অদৃষ্টে আহার তিনি আজ মাপান নি,—কিন্তু এখানে যে এমন ভূরি ভোজের ব্যবস্থা ক'রে রেখেছেন তিনি—তা কে জানত বলুন। আপনার হাতের রান্না খেয়ে, আজ আমার মা'র কথা মনে পড়ছে। তিনিও ঠিক এমনি রাঁধতে জানতেন, আর তাঁর আমোলে—আমাদের ঘরগুলোও এমনি গোছাল ছিল। মনে হচ্ছে, আমার মা বুঝি আজ ফিরে এলেন!"

সঙ্গে সঙ্গে খৃষ্টবাহনের দুই চক্ষু সজল হইয়া উঠিল,—শোভার চোখ দুটিও খৃষ্টবাহনের কথায় আর্দ্র হইয়া গেল।

আহারাদির পর খৃষ্টবাহন একটু সঙ্কোচের সহিত জিজ্ঞাসা করিল, "আচ্ছা, বলতে পারেন আপনি—এঁরা দুজনে হঠাৎ মির্জ্জাপুর গেলেন কেন?"

সহজ স্বরে শোভা কহিল, "আমি আপনার আসার কাছেই তাঁদের যাবার কথা শুনিছি। আপনিও কিছু জানতেন না?"

খৃষ্টবাহন গাঢ়স্বরে উত্তর দিল, "কিছু না। আমাকেও আয়াই খবরটা দেয়।"

শোভা কিয়ৎকাল নীরব থাকিবার পর সহসা জিজ্ঞাসার

ভঙ্গীতে কহিল, "আমি যদি আপনার স্ত্রীর সম্বন্ধে কোন কথা আপনাকে বলি, সেটা আপনি প্রসন্নভাবেই গ্রহণ করবেন?"

খৃষ্টবাহন সবিস্ময়ে কহিল, "আপনার এ কথার অর্থ ত আমি ঠিক বুঝতে পারছি না, আমাকে মাফ করবেন।"

শোভা কহিল, "আমার অনধিকারচর্চ্চা আপনি মার্জ্জনা করবেন। দেখুন, মেয়েদের উপর ভগবানের এমন একটু ক্ষমতা দেওয়া আছে, যার প্রভাবে তারা স্থিরচিত্তে একটু চেষ্টা করলেই পুরুষের প্রকৃতি নির্ণয় করতে পারে। আপনি এ কথা স্বীকার করেন কি?"

খৃষ্টবাহন অভিভূতের মত কহিল, "হাঁ, আমি এ কথা স্বীকার করি, আর বিশ্বাসও করি। কেন না, আমার মাকেও এ কথা বলতে শুনেছি।"

শোভা কহিল, "কতক্ষণই বা আপনার সঙ্গে আমার পরিচয় হয়েছে, কিন্তু এরই মধ্যে আমি আপনার প্রকৃতির পরিচয় পেয়েছি; তাই এতটা অসঙ্কোচে আপনার সঙ্গে কথা কইতে সাহস পাচ্ছি।"

খৃষ্টবাহন শোভার নির্ম্মল মুখখানির উপর সপ্রতিভভাবে চাহিয়া বলিল, "আপনার কথাগুলি শুনে আমি মুগ্ধ হলেও, ঠিক অনুসরণ করতে পারছি না যে—"

শোভা খৃষ্টবাহনের কথার উত্তর না দিয়া নিজের মনেই বলিতে লাগিল, "কথায় কথায় আপনি আপনার স্বর্গীয় মা'র কথা তুলে আমার প্রশংসা করে এতে আমার গৌরব বাড়িয়ে দিয়েছেন। এখন আমি যদি আপনার পুণ্যময়ী মা'র মেয়ের মত—আদরিণী

ভগিনীর অধিকারটুকু আপনার কাছে দাবী করি, সেটা কি আমার পক্ষে ধৃষ্টতা হবে ব'লে আপনার মনে হয়?"

খৃষ্টবাহন গাঢ়স্বরে কহিল, "না,—আমার ভগিনী নাই, যদি থাকত, তা হ'লে আজ আমি নিজকে সুখী মনে করতুম।—আমার মাকে আপনি দেখেন নি, কিন্তু তাঁর আকৃতির সাদৃশ্য আপনাতে আছে। আপনাকে ভগিনী ব'লে সম্মান দেবার অধিকার পেয়ে আমি নিজেকেই ভাগ্যবান্ মনে করছি।"

সুন্দর মুখে নির্ম্মল হাসির লহর তুলিয়া শোভা এবার আব্দারের স্বরে কহিল, "তা হ'লে আর ভাই-বোনের মধ্যে ও সব কথার সঙ্কোচ রেখে দরকার কি, দাদা। এসো, এবার ভাই বোনে ঘরসংসারের কথা কই —"

খৃষ্টবাহন স্তম্ভিত। এ কি সত্য? তাহার উষর জীবনটার ভার করিতে, তাহার মরুময় সংসারে শান্তির কুসুমকুঞ্জ রচনা করিতে, আদরিণী ভগিনীর স্নেহ লইয়া, সত্যই কি এই অমৃতভাষিণী মহীয়সী নারী তাহার বাংলোয় পদার্পণ করিয়াছেন? মুগ্ধভাবে সে বলিল,—"তোমার কথাতেই বলছি, বোন্ এক দণ্ডে যখন ভাইটির পরিচয় পেয়েছ, তখন এর অনেক আগেই তার ঘরসংসারের সমস্তই তোমার জানা শোনা হয়ে গেছে নিশ্চয়ই। নয় কি?"

শোভা পূর্ব্ববৎ হাসিয়া কহিল, "নইলে কি সাধ ক'রে আগে ঘরসংসারের কথা তুলি, দাদা? এই জন্যই আগে আমার বোনটির সম্বন্ধে তোমাকে প্রশ্ন করেছিলুম। তুমি ঠিক বুঝতে পার নি, আর তখন অধিকার না পেয়েই কোনও কিছু অনধিকার চর্চ্চা

অন্যায় মনে করবেই—বোনের অধিকারটুকু চেয়ে নিয়েছি। কিন্তু এখন আবার একটা মস্ত ভাবনা এসে জুটছে যে, দাদা ?"

সস্মিতভাবে খৃষ্টবাহন কহিল, "আবার কি ভাবনা হ'ল, শুনি ?"

ডাগর চক্ষু দুটি বিস্ফারিত করিয়া শোভা কহিল, "লিলি যদি এ অধিকার স্বীকার না করে ?—যদি ঝগড়া বাধিয়ে বসে ?"

হাসিয়া খৃষ্টবাহন কহিল, "ভাই-বোনে যদি মিল থাকে, বউএর সাধ্য কি কিছু করে !"

শোভা এবার দুষ্টুমীর হাসি হাসিয়া কহিল, "কিন্তু দাদা, বউএর দোষ দেখে যদি আমি শাসন করি ? তখন ত আমার ওপর রাগ করবে না ?"

খৃষ্টবাহন কহিল, "আমার বোন্ এমন কোন অন্যায় কখনই করতে পারে না, যাতে আমি রাগ করতে পারি।"

—আচ্ছা দাদা, বউএর যদি কোন অন্যায় দেখি, আর সে অন্যায় থেকে তাকে কৌশলে ফেরাবার জন্য তোমাকে কিছু বলি, তুমি তা শুনবে বল ?

—তোমার কথা আমি বাইবেলের প্যারার মত চিরদিন মানব, এ ভরসা আমার আছে।

শোভা এবার কিছু কুণ্ঠার সহিত কহিল, "আর বোন্‌টি যদি তার নিজের সংসারে কোনও অনাচার দেখে তোমার কাছে সাহায্য চায়, তখন তাকেও দেখবে ত, দাদা ?"

খৃষ্টবাহন হাসিয়া কহিল, "এ কি খুব বড় কথা হ'ল, বোন্ ?"

শোভা কহিল, "এতক্ষণ গৌরচন্দ্রিকা হ'ল, দাদা ! এবার কাজের কথা কইব। সে অনেক কথা দাদা, অনেকখানি সময়

যাবে শুনতে। তুমি একটু বিশ্রাম কর গে, আমি দুটি খেয়েই যাচ্ছি, গিয়ে সব বলব।"

খৃষ্টবাহন সবিস্ময়ে কহিল, "তোমার এখনও খাওয়া হয় নি ?"

শোভা হাসিয়া কহিল, "বা রে! খাব কখন্ বল! এখন না হয় দাদা হলে, তখনও ত নিমন্ত্রিত ছিলে। তার আগেই আমি খেয়ে ব'সে আছি—এ ধারণাটুকু তোমার কি ক'রে হল বল ত ?"

খৃষ্টবাহন সপ্রতিভভাবে কহিল, "অন্যায় বলিছি, দিদি!—যাক্, অনেক বেলা হয়েছে; খেয়ে নাও।—ওবেলা ধীরে সুস্থে সব কথা শুনব তোমার।"

শোভা ভোজন-ঘরে যাইতে যাইতে বলিল,—"কিন্তু আমি ব'লে রাখছি দাদা, আমার কথা শুনে একটুও রাগ করতে পারবে না,—আমি যা যুক্তি দোব, সেইমত করা চাই।"

"আচ্ছা গো—তাই হবে। বোনের কথা তোমার দাদা কখনও ঠেলবে না—স্থির জেনো।"

পাঁচ

অপরাহ্ণে দীর্ঘ দুইটি ঘণ্টা ধরিয়া ভাই ও ভগিনীর মধ্যে নানা কথা ও পরামর্শ হইল।

রাত্রি প্রায় বারোটার সময় লিলি ও আনন্দমোহন বাংলোয় ফিরিয়া আসিল। লিলি ঘরে ঢুকিয়া দেখিল, খৃষ্টবাহন ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। ঘুমন্ত স্বামীর উদ্দেশ্যে গরলোদ্গার করিতে করিতে সেও শয্যা গ্রহণ করিল।

আনন্দমোহন কম্পিতপদে কক্ষে ঢুকিয়া দেখিল, শোভা তাহার খাবার বাড়িয়া বসিয়া আছে। আনন্দমোহন শোভার গম্ভীর মুখের উপর চাহিয়া প্রশ্ন করিল,—"আমার চিঠি পেয়েছিলে ?"

সহজস্বরেই শোভা কহিল,—"হ্যা, বিশেষ দরকারের শেষ বুঝি এতক্ষণে হ'ল ?"

আনন্দমোহন পোষাক ছাড়িতে ছাড়িতে কহিল, "আর বল কেন! মির্জ্জাপুরে ইয়ংমেন এসোসিয়েসনের কনফারেন্স বসছে ন,—তাতে স্পীচ দেবার জন্য বেভারেণ্ড মিটার ধ'রে নিয়ে গেল,—মিসেস রায়ও নাছোড়বান্দা,—তুমি তখন মার্কেটে গিয়েছ, এ দিকে সাতটায় ট্রেণ, কাযেই চিঠি লিখেই ছুটতে হয়েছিল—"

শোভা স্থিরদৃষ্টিতে স্বামীর মুখের দিকে চাহিয়া কহিল, "এখন খেতে হবে ত ?"

আনন্দমোহন শয্যায় দেহখানি প্রসারিত করিয়া উত্তর দিল, "ও পাট সেখানেই সেরে আসা গেছে। খুব খাইয়েছে তারা। খাওয়াবে না ? যে তোড়ে স্পীচ্ দিয়েছি, শুনে সবাই হকচকিয়ে গেছে —"

অধিক রাত্রিতে আনন্দমোহনের চীৎকার শুনিয়া শোভা ধড়মড় করিয়া উঠিয়া পড়িল। তাড়াতাড়ি আলো উজ্জ্বল করিয়া দিয়া স্বামীর মুখের দিকে চাহিতেই সে বুঝিল, আনন্দমোহন ঘুমের ঘোরে কথা কহিতেছে। সে আড়ষ্ট হইয়া স্বামীর ভাবোচ্ছ্বাস শুনিতে লাগিল, আনন্দমোহন বলিতেছিল, "চালাও পান্সা,—কেমন মজা! দরিয়ার মাঝে দুটি প্রাণী আমরা—তুমি আর আমি। আঃ—কাছে এসো লিলি, আরো কাছে; লজ্জা কিসের ? ভয় কি ?

কে দেখবে ?—ওরা দাঁড়ী-মাঝি—জানোয়ারের সামিল, ওদের দেখে লজ্জা ? কেউ জানবে না, শোভাকে বলব যে, কনফারেন্সে স্পীচ দিতে এসেছি।—হাঃ হাঃ হাঃ !"

উচ্চহাস্য করিয়া আনন্দমোহন আবার ঘুমাইয়া পড়িল। শোভা পূর্ব্ববৎ আড়ষ্ট হইয়া অপলকনেত্রে তাহার স্বামীর মুখখানির উপর চাহিয়া রহিল।

পরদিন একটু বেলাতেই আনন্দমোহনের ঘুম ভাঙিল। শোভা তাড়াতাড়ি চা আনিয়া স্বামীর সম্মুখে ধরিল, কিন্তু কোন কথাই কহিল না। স্ত্রীকে আজ অতিরিক্ত গম্ভীর দেখিয়া আনন্দমোহনের মনে সন্দেহের রেখাপাত হইল। শোভাকে একটু নাড়া দিবার অভিপ্রায়ে সে নিজেই কহিল, "আজও আবার কনফারেন্স আছে, তবে আজ খাওয়া-দাওয়া সেরেই যাব মনে করছি—"

শোভা স্বামীর মুখের দিকে চাহিয়া স্বাভাবিকভাবেই জিজ্ঞাসা করিল, "আজকের কন্‌ফারেন্সটা বসছে কোথায় ?"

আনন্দমোহন চায়ের বাটিতে একটি চুমুক দিয়া উত্তর দিল, "সেইখানেই, কাল যেখানে বসেছিল—"

শোভা অসাধারণ ধৈর্য্যের সহিত অতি সহজ স্বরেই কহিল, "কালকের সেই পান্‌সীখানার ওপরেই ?"

আনন্দমোহনের সর্ব্বাঙ্গে কে যেন একসঙ্গে কতকগুলি হুল ফুটাইয়া দিল। মনে মনে শিহরিয়া সে নির্ব্বাক্‌ভাবে শোভার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

শোভা কিছুমাত্র বিচলিত না হইয়া পূর্ব্ববৎ ধৈর্য্যের সহিত কহিল, "আর লিলি ত আজও তোমার স্পীচ শোনবার শ্রোত্রী হয়েই যাবে ?"

এবার আনন্দমোহন আত্মসংবরণ করিয়া মহা বিস্ময়ের ভাব প্রকাশপূর্ব্বক অভিনয়ভঙ্গীতে কহিল, "তুমি পাগল হয়েছ না কি? এ সব কি বলছ?"

শোভা তাহার কথার উত্তর না দিয়াই পূর্ব্ববৎ স্বরে কহিল, "আমার শেষ প্রশ্নটাও ক'রে নিই,—কাল যে স্পাচ তুমি দিয়েছিলে, তার কিছু বকসিস্ লিলি দিয়েছিল কি?"

বিস্ময়ের সহিত ক্রোধের বিকাশ করিয়া আনন্দমোহন এবার অসহিষ্ণুভাবে কহিয়া উঠিল, "তোমার মুখে এ সব কি নোংরা কথা, শোভা? তুমি কি স্বপ্ন দেখছ?"

শোভা এবার ঈষৎ দৃঢ়স্বরে উত্তর দিল, "স্বপ্ন আমি দেখিনি, দেখেছ তুমি। আর এ স্বপ্ন সত্য কি মিথ্যা, ঈশ্বরের নাম ক'রে তোমার অন্তরকে জিজ্ঞাসা করলেই তার উত্তর পাবে।" বলিতে বলিতে তাহার স্বর গাঢ় হইয়া আসিল, পরক্ষণেই ছায়ার মত সে স্থান হইতে সে সরিয়া গেল।

আনন্দমোহন অপরাধীর মত শোভার গমন-গতির দিকে চাহিয়া স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিল। শোভা কি অন্তর্যামিনী? কিম্বা, ঘুমের ঘোরে সে সমস্ত প্রকাশ করিয়া ফেলিয়াছে?

কিছুক্ষণ পরেই শোভা আনন্দমোহনের কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। শোভাকে দেখিয়াই সে তাড়াতাড়ি একখানি খবরের কাগজ টানিয়া লইল।

শোভা জানিত, তাহার স্বামীর দুর্ব্বলতা কখন্ কি ভাবে আত্ম প্রকাশ করে। সে বুঝিল, তাহার সহিত চোখোচোখি হইয়া কথা কহিবার সামর্থ্য এখন আনন্দমোহনের নাই। চরিত্রগত দুর্ব্বলতা

সত্ত্বেও, তাহার ভাবপ্রবণ প্রকৃতির পারিপার্শ্বিক সুকুমার প্রবৃত্তি-গুলি শোভা এত প্রীতির দৃষ্টিতে দেখিত যে, তাহাদের প্রাবল্যে, স্বামীর অপরাধ অমার্জ্জনীয় হইলেও সে ভুলিয়া যাইত,—আনন্দ-মোহনকে অভিভূত দেখিলে বা তাহার উজ্জ্বল চক্ষু দুইটি সজল হইয়া উঠিলে সে কিছুতেই আত্মসম্বরণ করিতে পারিত না।—নিজের এই দুর্ব্বলতাটুকু স্বামীর সমক্ষে অপ্রকাশ রাখিবার জন্য শোভাকে সময়ে সময়ে অন্তরের সহিত কঠোর সংগ্রাম করিতে হইত।

পাছে তাহাকে দেখিয়া লজ্জায় মুহ্যমান অপ্রস্তুত স্বামীর সুকুমার মনোবৃত্তিগুলি সহসা আত্মপ্রকাশ করিয়া শোভাকেও অভিভূত করিয়া ফেলে, এই আশঙ্কায় সে কিছুমাত্র ভূমিকা না করিয়াই কহিল,—"বিন্ধ্যাচলে দিন কতক থাকবার বড় ইচ্ছা হয়েছে, যাবে?"

আনন্দমোহন কাগজের উপর হইতে চক্ষু তুলিয়া বিস্ময়ের সুরে কহিল, "বিন্ধ্যাচল! সেখানে আবার মানুষে যায়—আমার ত মোটেই সহ্য হবে না,—চুনার ছেড়ে আমি কোথাও যেতে পারব না, তা ব'লে রাখছি কিন্তু—"

শোভা কহিল,—"তা হ'লে দিন কতকের জন্য আমাকে ছুটী দাও না,—আমি ঘুরে আসি। যে'দিন এখানে থাকবে, সে সব তোমার ক'রে কম্মে দেবে—"

আনন্দমোহন কহিল,—"কার সঙ্গে যাবে?"

শোভা কহিল,—"মিষ্টার রায় তাঁর কারবারের কি একটা দর-কারে যাচ্ছেন কি না,—অষ্টভূজা পাহাড়ের ওপর ডাকবাংলো আছে,—সেটা নাকি ভাড়া করেছেন,—আর লিলিও সঙ্গে যাচ্ছে—"

আনন্দমোহন ব্যগ্রভাবে কহিয়া উঠিল,—"তাই না কি?" পরক্ষণেই অভিনেতার মত কৌশলে নিজের ব্যগ্রভাব গোপন করিয়া বলিল,—"মিষ্টার রায় সে দিন বিন্ধ্যাচলের সুখ্যাতি করছিলেন বটে। আর শুনছি, অষ্টভুজার পাহাড়ের ওপর যে বাংলো আছে, সেটা'ও নাকি চমৎকার? তা বেশ, চল, দিন কতক ঘুরে আসা যাক।"

স্বামীর মুখের দিকে চাহিয়া, একটি গভীর নিশ্বাস ফেলিয়া শোভা উঠিয়া গেল। আনন্দমোহন স্তব্ধভাবে সেই দিকে চাহিয়া রহিল। সুকৌশলে আত্মসম্বরণ করিতে সমর্থ হইলেও, সে যে স্ত্রীর চক্ষুকে প্রতারিত করিতে পারে নাই, তাহা শোভার দৃষ্টি ও গতি হইতেই অনুমান করিয়া লইতে তাহার বিলম্ব হইল না।

সেই দিনই অপরাহ্নে স্থির হইয়া গেল, উভয় পরিবার পরদিন প্রত্যূষেই বিন্ধ্যাচল রওনা হইবে।

ছয়

লোকালয়ের বাহিরে অভ্রভেদী পর্ব্বতের উপর সুন্দর বাংলো, নিম্নে সমতল হইতে দেখিলেই মনে হয়, যেন কতকগুলি শ্বেত পারাবত পাখা মেলিয়া পর্ব্বতশৃঙ্গে বসিয়া আছে।

খৃষ্টবাহন ও আনন্দমোহন সপরিবার যথাসময় এই বাংলোয় আসিয়া উঠিল। বাংলোখানির অবস্থান-সৌন্দর্য্য ও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা দেখিয়া সকলেরই আনন্দ হইল। ঘরগুলি দেখিতে দেখিতে শোভা লিলিকে কহিল, "এই দুখানি ঘর তোমার, এই

ঘরে রান্না হবে, আর ভাঁড়ার থাকবে, এই ঘরখানিতে খাওয়াদাওয়া করবে, এর পাশেই তোমাদের বৈঠকখানা, দিব্যি সাজান রয়েছে।"

লিলি মনে মনে শোভার নির্ব্বাচনের প্রশংসা করিয়া কহিল, "আর তুমি নিচ্ছ কোন্ কোন্ ঘর ?"

শোভা কহিল, "সে আমি আগেই দেখে রেখেছি ; নিজের ব্যবস্থা আগে না ক'রে তোমার জন্যই যে লেগে পড়েছি, এতটা বোকা আমাকে ভেব না।"—বলিতে বলিতে বাংলোর অপরাংশে একখানি অপেক্ষাকৃত ছোট ঘর দেখাইয়া বলিল, "দেখছ ত, এই ঘরখানি আমি নিজের জন্য বেছে নিয়েছি ; এই ঘরেই রান্নাও হবে, খাওয়াও চলবে।"

সবিস্ময়ে শোভার মুখের দিকে চাহিয়া লিলি কহিল, "এই ছোট্ট ঘরখানিতে তোমার কি ক'রে চলবে ? কোথায় রাঁধবে, খাওয়া-দাওয়া করবে কোথায়, বসবেই বা কোন্‌খানে ?"

শোভা কহিল, "কেন, এইখানে রান্নাবান্না করব ; এই দুটো আলমারিতে ভাঁড়ার রাখব ; আর খাবার যায়গা হবে এই ধারে। দুটি প্রাণীর সংসার, এত বড় ঘরে কুলবে না ?"

লিলি শোভার মুখের দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "উঠবে বসবে কোথায় ?"

মুখ টিপিয়া হাসিয়া শোভা বলিল, "কেন, এইখানেই. মেয়েদের রান্নাঘরের চেয়ে ভাল বৈঠকখানা আবার কোথা ? ঐ যে দেখ না, বসবার জন্য একখানা ছোট টুলও এনে রেখেছি।"

মনে মনে জ্বলিয়া আরক্তমুখে লিলি পুনরায় জিজ্ঞাসা করিল, "শয়নটা কোথায় হবে শুনি ! এই ঘরেই না কি ?"

শোভা হাসিয়া কহিল, "ভাব থাকলে তাতেও আটকায় না। শোননি একটা প্রবাদ আছে -- ভাব থাকলে এক কম্বলে সাত জন দরবেশ সুখে ঘুমোয়, আর ভাব না থাকলে পাশাপাশি দুই রাজ্যে দুজন রাজা ঘুমোতে পারে না।"

বিচিত্র মুখভঙ্গী করিয়া লিলি কহিল, "আমরা ত দরবেশ নই যে, তাদের উপমাটা দিলে—"

শোভা বলিল, "পাহাড়ে এসে যে কটা দিন কাটান যায়, না হয় তাদেরই মতন হলুম। তা বোন্, শোবার ঘরের জন্য আটকাবে না; বাইরের অত বড় সাজান হল-ঘর রয়েছে; তা ছাড়া— রাত্রিটুকু না হয় তোমার ঘরেই দুই বোনে একসঙ্গে কাটিয়ে দেব।"

লিলি অবাক্ হইয়া শোভার মুখের দিকে চাহিল। শোভা তাহার বিস্ময়বিমুগ্ধ ভাবভঙ্গী দেখিয়া হাসিয়া কহিল, "মনে মনে আমি একটা বড় মজার মতলব এঁটেছি, হল-ঘরে চল, সেখানে সকলের সামনেই সেটা বলব। তোমারই তাতে বেশী লাভ, আর আমোদও পাবে প্রচুর।"

বড় হলঘরখানিতে বসিয়া আনন্দমোহন ও খৃষ্টবাহন বিন্ধ্যাচল সম্বন্ধে কথাবার্ত্তা কহিতেছিল। শোভা লিলির হাত ধরিয়া সেই ঘরে আসিয়া কহিল, "আচ্ছা, এ কথা কি সত্য নয় যে, সংসারে যত কিছু বৈচিত্র্য, তার সৃষ্টি এই পাহাড় থেকেই?"

সকলের চক্ষু শোভার মুখের ওপর পড়িল। খৃষ্টবাহন কহিল, —"আমার ত তাই মনে হয়। আপনি কি বলেন মিষ্টার দে?" বলিয়া আনন্দমোহনের মুখের দিকে সে তাকাইল।

আনন্দমোহন কহিল,—"হাঁ, কথাটা মিথ্যা নয়; তবে যত কিছু

বৈচিত্র্য, তার সবই যে পাহাড়ের প্রাপ্য, তা নয়,—তাদের কতক নভোমণ্ডলে, কতক সমুদ্রের জলে, কতক বা পাহাড়ে—” পরক্ষণে লিলির মুখের দিকে কটাক্ষ করিয়া কহিল,—“আপনি এ সম্বন্ধে কিছু বলবেন, মিসেস্ রায়?”

লিলি অবিচলিত স্বরে কহিল,—“উপস্থিত ক্ষেত্রে আমি ত সব চেয়ে বড় বৈচিত্র্য দেখছি, আমাদের এই পাহাড়ে আসার ব্যাপারে।”

খৃষ্টবাহন অর্থপূর্ণ নয়নে পত্নীর মুখের দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিল,—“তার মানে?”

লিলি কহিল,—“কোনরকমে গলদ্‌ঘর্ম্ম হয়ে আমরা ত এখানে এসেছি, আমাদের জিনিসপত্রও সব ঠিকঠাক এসে পড়েছে দেখছি—আসে নি কেবল লোকজন কেউ। আমার আয়াকেও দেখছি না, ওদের সেই চাকরটিরও পাত্তা নেই। এর চেয়ে বড় বৈচিত্র্য ত আমার চোখে কিছুই ঠেকছে না।”

আনন্দমোহন হো হো শব্দে হাসিয়া উঠিল। খৃষ্টবাহন অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে শোভার দিকে চাহিল। সঙ্গে সঙ্গে শোভার মুখের উপর এক ঝলক হাসির লহর খেলিয়া গেল। শোভা কহিল, “তোমার এই বৈচিত্র্যের মীমাংসা আমি ক'রে দিচ্ছি, আগে আমার প্রস্তাবটা বলতে দাও, বোন্।”

আনন্দমোহন জিজ্ঞাসুনয়নে শোভার মুখের দিকে চাহিয়া কহিল, “তোমার আবার প্রস্তাব আছে না কি?”

শোভা বলিল,—“প্রস্তাব নিয়েই না আমি এসেছি। আমার প্রস্তাবটি এই—বৈচিত্র্যের আধার এই পর্ব্বত-প্রবাসে আমরা যে

কটা দিন থাকি, আমাদের জীবনযাপনের ধারাটাও হোক্ বৈচিত্র্যময়।"

লিলি জিজ্ঞাসা করিল,—"সেটা কি রকম শুনি? তোমার সেই দরবেশী উপমাটির মত না কি? এক কম্বলে"—

শোভা বাধা দিয়া কহিল,—"সত্যই বোন্, এখানে যে কদিন আমরা থাকব, দরবেশের মতই পবিত্রভাবে জীবনযাপন করতে চাই, আর সেই জীবনযাত্রার ধারাটা হবে কি রকম, তাও বলছি শোন।"—

আনন্দমোহন ও লিলি যুগপৎ শোভার মুখের দিকে নির্ব্বাক্ ভাবে চাহিল। শোভা বলিতে লাগিল, "এ ক'দিন আমার স্বামী ও সংসারের ভার নেবে তুমি; তোমার সংসার ও তোমার স্বামীর ভার নেব আমি।"

বিস্ময় কৌতুকভরা নয়নে আনন্দমোহন লিলির মুখের দিকে চাহিয়াই পরক্ষণে খৃষ্টবাহন ও শোভার মুখের উপর দৃষ্টিস্থাপন করিল। লিলি অবাক্ হইয়া শোভার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। ইতিপূর্ব্বে শোভা যে কথাগুলি রহস্যচ্ছলে বলিয়াছিল, সেইগুলি তাহার কানে ধ্বনিত হইতেছিল। সে ভাবিতেছিল, সত্যই কি এই অভিপ্রায়টি স্বাভাবিকভাবেই শোভার অন্তর হইতে উদ্গত হইয়াছে? কিম্বা তাহাকে সমস্যায় ফেলিয়া পরীক্ষা করিবার একটা অভিনব চাল চালিয়াছে?

সকলকেই নীরব দেখিয়া খৃষ্টবাহন ঈষৎ হাসিয়া কহিল, "দেখুন, যদি সকলের এতে মত হয়, আমার কোনও আপত্তি নেই। কিন্তু আপনার কথাগুলি আরও একটু খোলাখুলিভাবে বলা উচিত। কি বলেন, মিঃ দে?"

আনন্দমোহন স্মিতমুখে কহিয়া উঠিল, "নিশ্চয়ই।"

শোভা কহিল,—"ভার নেওয়া বলতে দয়া ক'রে আপনাদের এইটুকু বুঝতে হবে যে, এখানে যে কদিন আমরা আছি,—আমাদের জীবনযাত্রার রোজনামচা হবে এই রকম—"

তিন জনেই শোভার মুখের দিকে চাহিয়াছিল। শোভা কহিয়া চলিল,—"ধরুন, এই আপনার চা, জলখাবার, দিনরাতের খাবার—যা কিছু ব্যবস্থা করব আমি নিজে,—কাপড় চোপড় গুছিয়ে রাখা, ভাঁড়ার দেখা, বিছানাপত্র পাতা—সেও করব আমিই, লিলি এতে হাত দিতে পারে না। এমনই লিলিও ওর সব ব্যবস্থা নিজে করবে, আমি তাতে হাত দেব না। রাত্রি ন'টার মধ্যে আমাদের খাওয়া দাওয়ার পাট চুকিয়ে নিতে হবে। লিলি আর আমি রাত্রিতে এক বিছানায় শোব,—আর আপনারা দুই বন্ধুতে এই ঘরে রাত্রিবাস করবেন। আমরা এখানে পবিত্রভাবে জীবন যাপন করব। ঈশ্বর সাক্ষ্য ক'রে আমাদের শপথ করতে হবে।"

খৃষ্টবাহন ঈষৎ হাসিয়া আনন্দমোহনের দিকে চাহিয়া কহিল, "কি বলেন?"

আনন্দমোহন হাসিয়া বলিল,—"মন্দ কি! আপনার ও আপত্তি কিছু নেই?"

খৃষ্টবাহন সহাস্যে উত্তর দিল,—"কিছুমাত্র না। এ সম্বন্ধে চিরদিনই আমি উদারমতাবলম্বী।"

শোভা লিলির দিকে চাহিয়া কহিল,—"তুমি ত কিছু বলছ না, ভাই?"

লিলি কিছু তপ্ত স্বরেই উত্তর দিল,—"তোমাদের তিন জনেরই

যখন এক মত, আমার অমত হলেও ভোটে হেরে যাব। কিন্তু আমার একটা কথা বলবার আছে, -লোকজন ত কাউকে আনা হয় নি দেখছি,—তার ব্যবস্থাটা কি হবে ?"

খৃষ্টবাহন একটু দৃঢ়স্বরে উত্তর দিল,—"সে ব্যবস্থা নিজেদেরই চালিয়ে নিতে হবে। যখন আসে নি, আর এই পাহাড়ে লোকজন পাওয়াও যখন সম্ভবপর নয়, তখন আর উপায় কি ?"

লিলি দৃপ্ত নয়নে স্বামীর মুখের দিকে চাহিল। কোন উত্তর না দিলেও মনে হইতেছিল যে, তাহার দুই চক্ষুর তারদৃষ্টি তীক্ষ্ণ কটূক্তির মত খৃষ্টবাহনকে বিদ্ধ করিতেছে।

শোভা এই সময় মুখ টিপিয়া হাসিয়া কহিল,—"কিন্তু মিঃ রায়, অন্ততঃ জলের ব্যবস্থাটুকু ক'রে দিতে হবে যে। লিলি পাহাড়ে দেশে থাকে, পাতকো থেকে জল টানবার ক্ষমতাও হয় ত রাখে,—কিন্তু আমি যে একবারে খাস কলকেতার মেয়ে,—জল টল টানতে পারবনা, তা ব'লে রাখছি।"

খৃষ্টবাহন কহিল,—"জলের ব্যবস্থা ত আগেই ক'রে রাখা হয়েছে। বাংলোর জিম্মাদার নিজেই দরকারমত জল সরবরাহ করবে।"

শোভা যেন স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিয়া কহিল,—"আর ভাবনা কিসের ভাই! চল—যে যার ভাঁড়ার গুছিয়ে নিই,—নূতন সংসারযাত্রা আরম্ভ করা যাক তা হ'লে!"

রাগে গস্ গস্ করিতে করিতে লিলি শোভার অনুসরণ করিল।—আর দুই বন্ধু বোধ হয় নূতন সংসারযাত্রার গতিপথ কল্পনার সাহায্যে চিত্রিত করিতে বসিল। কে জানে কাহার পরিণাম কি ?

সাত

যদিও একটু বেলাতেই নূতন সংসার-পর্ব্ব আরম্ভ হইয়াছিল, তবুও শোভার অসাধারণ তৎপরতায় খৃষ্টবাহন বেলা বারোটার মধ্যেই মধ্যাহ্নভোজন সমাপন করিয়া পরিতৃপ্ত হইল।

খাইতে খাইতে শোভাকে সে কৌতুকভরে জিজ্ঞাসা করিল,—"ওপাড়ার খবর কিছু রেখেছ, বোন্?"

শোভা দুই চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া ক'হল, "ও বাবা, এর ওপর খবর নিতে গেলে লিলি রক্ষা রাখবে, দাদা! একে ত সে আমার ওপর আগুন হয়ে আছে। তবে মাঝে মাঝে যে রকম সাড়া-শব্দ পাচ্ছি, তাতে মনে হচ্ছে, সূর্য্য পাটে বসবার আগে ওদের খাবার পাট উঠবেনা।"

খৃষ্টবাহন কহিল, "কিন্তু আমি অবাক হয়ে যাচ্ছি, এত অল্প সময়ের মধ্যে এতগুলো তরকারী তুমি বাঁধলে কি ক'রে?"

শোভা হাসিয়া কহিল, "তোমার কারবারে হঠাৎ কতকগুলো অভাব এসে পড়লে, অল্পসময়ের মধ্যেই তুমি কি ক'রে সে সব সরবরাহ কর, দাদা?"

খৃষ্টবাহন উত্তর দিল, "তার সঙ্গে এর তুলনা! সে ত আমি একা করিনে, একপাল লোক আছে। কিন্তু তোমার কাজ যে অদ্ভুত।"

শোভা অপরাহ্নের জলখাবার গুছাইতে গুছাইতে কহিল,

"কোন কায করবার আগে ভাবতে বসলেই অদ্ভুত মনে হয়, কিন্তু সাহস ক'রে লেগে পড়লে, সে খুব সোজা হয়ে যায়।"

— ও সব আবার কি ?

—ওবেলার জলখাবার। সে পাটটা এবেলাই সেরে রাখলুম, শুধু চাটুকু করবার কায বাকি রইল! এক একবার মনে হয়, ছুটে গিয়ে লিলির রান্না বান্নাগুলোও ক'রে দিয়ে আসি।

খৃষ্টবাহন হাসিয়া কহিল, "তা হ'লে এত হাঙ্গামার দরকার ছিল কি ? এরই মধ্যে এত দুর্ব্বল হয়ে পড়লে, বোন্।"

শোভা গাঢ়স্বরে কহিল, "আসল কথাটার খেই হারিয়ে ফেলি দাদা, ওদের যে শাসন করতে এত কঠিন হয়েছি, তা মনে থাকে না। তার ওপর, আমোদে যেমন ওঁর স্পৃহা, ভোজনটির বেলারও তেমনই। খাবার ওঁর কষ্ট হচ্ছে মনে হলেই—" বলিতে বলিতে শোভা অভিভূত হইয়া পড়িল।

খৃষ্টবাহন কহিল, "ছিঃ, এত দুর্ব্বল তুমি, শোভা। কঠিন না হলে ত শাসন চলেনা, বোন্, শেষে যে সবটাই প্রহসন হয়ে দাঁড়াবে।"

দৃঢ়ভাবে এবার শোভা কহিল, "না দাদা, আর দুর্ব্বল হবনা, এবার খুব কঠিন হয়েই চলব।"

এ দিকে বেলা আড়াইটার পর মধ্যাহ্নভোজনে বসিয়া আনন্দমোহন লিলির রন্ধননৈপুণ্যের পরিচয় পাইয়া চমৎকৃত হইল। ভাতগুলি গালয়া পিণ্ডের মত হইয়াছে, ডাল ধরিয়া গিয়া অখাদ্য হইয়াছে, ডিমের কালিয়ায় বার দুই নুন পড়ায় মুখে দিবার উপায় নাই।

লিলি জিজ্ঞাসা করিল, "রান্নাগুলো হয়েছে কেমন ?"

আনন্দমোহন ডিমের ভিতরের কুসুমটুকু মুখে দিয়া কহিল, "খাসা।"

লিলি অভিমানভরে কহিল, "বুঝিছি, ঠাট্টা হচ্ছে।"

আনন্দমোহন হাসিয়া কহিল, "ঠাট্টা-মস্করার সময় অনেক আছে, খাবার সময় ওটার ব্যবহার আমি বড় একটা করি না—"

লিলি কহিল, "এ বেলা তাড়াতাড়িতে রান্না হয় ত সুবিধের হয়নি, ও বেলা তোমাকে ভাল ক'রে খাওয়াব। তোমাকে কিন্তু কাছে থাকতে হবে, একলা একলা আমার কিছুই ভাল লাগে না। তুমি কাছটিতে ব'সে গল্প করবে, আমি তাই শুনতে শুনতে রাঁধব—কেমন ?"

আনন্দমোহন কহিল, "তোমার সঙ্গ ছেড়ে আমি এক দণ্ডও থাকতে ভালবাসি না। সেই বেশ কথা, ও বেলা তুমি রাঁধবে, আমি তোমাকে সাহায্য করব। বেশ আমোদেই কটা দিন কেটে যাবে।"

কোন রকমে ভোজন-পর্ব্ব শেষ করিয়া পরিপূর্ণ ক্ষুধা লইয়াই আনন্দমোহন বাহিরে আসিয়া বসিল। খৃষ্টবাহন তখন আরাম কেদারায় অঙ্গ ঢালিয়া খবরের কাগজ পড়িতেছিল। বন্ধুকে দেখিয়া কহিল, "খাওয়া বুঝি হ'ল এতক্ষণে। কেমন তৃপ্তিতে খেলে ভাই ?"

আনন্দমোহন একটু গম্ভীর হইয়াই উত্তর দিল, "চমৎকার!"

রাত্রির আহারপর্ব্ব হইল আরও অপূর্ব্ব! হাওয়ায় ঘী চড়াইয়া লিলি আনন্দমোহনের সহিত গল্প যুড়িয়া আনন্দের একটু বাড়াবাড়িই বোধ হয় করিয়া ফেলিয়াছিল, দুজনে কি একটা রহস্যজনক কথা

লইয়া হাসিয়াই অস্থির, উনুনের দিকে আর খেয়াল ছিল না ; এ অবস্থায় হাণ্ডার ঘী জ্বলিয়া উঠিল। লিলি বা আনন্দমোহন এমন ব্যাপার আর কখনও দেখে নাই, আমোদ-প্রমোদ তাহাদের মাথায় গিয়া উঠিল, দুজনেই চীৎকার করিতে লাগিল, "নেবাও, নেবাও, অগ্নিকাণ্ড—অগ্নিকাণ্ড—"

সঙ্গে সঙ্গে নিজের ঘর হইতে শোভা ছুটিয়া আসিল, তখনও হাণ্ডার ভিতর ঘী জ্বলিতেছিল। শোভা ক্ষিপ্রহস্তে একখানা থালা লইয়া হাণ্ডার মুখে চাপা দিল, অগ্নিকাণ্ডও তৎক্ষণাৎ থামিয়া গেল। খৃষ্টবাহনও ঠিক এই সময় বাহিরের ঘর হইতে ছুটিয়া আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "ব্যাপার কি ?"

শোভা হাসিয়া কহিল, "বিশেষ কিছু নয়, চায়ের পিয়ালায় একটু তুফান উঠেছিল।" তাহার পর লিলির দিকে চাহিয়া বলিয়া গেল, "হাঁড়ীতে ঘী চড়িয়ে গল্প করতে নেই, আর যদি কখনও এমন হয়, তখনি হাঁড়ীর মুখে চাপা দিতে হয়।"

শোভার কথা কাঁটার মত লিলির গায়ে বিঁধিলেও সে কোনও জবাব দিল না। এই আকস্মিক অগ্ন্যুৎপাতে সে এতটা বিহ্বল হইয়া পড়িয়াছিল যে, তখনও তাহার সর্ব্বাঙ্গ কাঁপিতেছিল। সে রাত্রিতে তাহাদের আর রন্ধন হইল না, আর এক দফা চা ও কয়েকটা ডিম সিদ্ধ খাইয়াই তাহারা দুজনে রাত্রির ভোজনপর্ব্ব শেষ করিল।

এক দিনেই লিলির উদ্ভাসিত অতুলনীয় সৌন্দর্য্য আনন্দমোহনের নয়নে কেমন যেন বিসদৃশ ও ফ্যাকাসে বলিয়া অনুমিত হইল। শোভার শান্তশ্রীমণ্ডিত মুখখানি অনবরতই তাহার চক্ষুর উপর

ফুটিয়া উঠিয়া তাহাকে আকুল করিয়া তুলিতে লাগিল। বারো ঘণ্টার ভিতরেই সে উভয়ের পার্থক্য কতখানি, তাহার কতকটা পরিচয় পাইল।

রাত্রিতে হলঘরে দুই বন্ধুর শয়নের ব্যবস্থা হইয়াছিল। খৃষ্টবাহন জিজ্ঞাসা করিল, "লিলিকে লাগছে কেমন?"

আনন্দমোহন উত্তর দিল, "খাসা! যেন ঠিক একটি তপ্ত বয়লার! শোভাকে তুমি কেমন দেখছ?"

খৃষ্টবাহন গম্ভীরভাবে বলিল, "চমৎকার! যেন একখানি আইস বার্গ!"

আট

লিলির হাতে আসিয়া তিনটি দিনের মধ্যেই আনন্দমোহনের পরিপূর্ণ চৈতন্য হইল। ভোজনবিলাসী আনন্দমোহন এই তিন দিনের নাম মাত্র কদর্য্য আহারে অতিষ্ঠ হইয়া উঠিয়াছিল। লিলির সাহচর্য্য তাহার পক্ষে ক্রমে বিষের মত অসহ্য হইয়া পড়িল। সে যেন তাহার সংস্রব এড়াইতে পারিলেই বাঁচে। লিলিরও এই কয়দিনে চক্ষু ফুটিয়াছিল, আনন্দমোহনের ভিতরের মূর্ত্তি ক্রমশঃ সে চিনিতে পারিয়া বুঝিয়াছিল, তাহার ক্ষমাশীল সহিষ্ণু স্বামীর তুলনায় আনন্দমোহন কত নীচ, কত বড় স্বার্থপর। আর সঙ্গে সঙ্গে শোভার সহিত নিজেকে তুলনা করিয়া সে জানিয়াছিল, কত তফাতে সে পড়িয়া আছে, শোভার পদতলে বসিয়া সে এখনও কত বিষয়ই না শিখিতে পারে!

এদিকে, আনন্দমোহনের মলিন মুখখানি শোভার বুকের মধ্যে হাহাকার তুলিতে থাকে। খাবার ত্রুটি কখনও যাহার জীবনে ঘটে নাই, আজ কয় দিন সে যে খাবার কষ্ট পূর্ণমাত্রাতেই পাইতেছে, স্বামীর ম্লান মুখখানিই স্পষ্ট করিয়া তাহা প্রকাশ করিতেছিল। খৃষ্টবাহনের জন্য মধ্যাহ্ন-ভোজনের খাবার সাজাইতে বসিয়া শোভা তাহার হতভাগ্য স্বামীর আহার্য্যের অবস্থা ভাবিয়া একবারে যেন মুসড়াইয়া পড়িতেছিল।

খৃষ্টবাহন ভোজন করিতে আসিয়া কহিল, "ও পাড়ার অবস্থা খুব কাহিল বলেই মনে হচ্ছে, শোভা! তোমার শাসনের ফল হাতে হাতে ফল্লো ব'লে!"

শোভা কষ্টে আত্মসম্বরণ করিয়া খাবারের থালা খৃষ্টবাহনের সম্মুখে ধরিয়া দিল, কথার কোন উত্তর দিল না।

খৃষ্টবাহন শোভার মুখের দিকে চাহিয়া ঈষৎ চমকিত হইয়া কহিল, "তোমার হয়েছে কি, বোন্! মুখখানি যে একবারে শুকিয়ে গেছে দেখছি। ছি, ছি, আবার সেই দুর্ব্বলতাকে মনে মনে প্রশ্রয় দিয়েছ?"

শোভা কহিল, "আগে এতটা ভাবতে পারি নি, দাদা! শাসন করতে ব'সে, নিজেও তার মধ্যে যে জড়িয়ে পড়েছি—এখন তা বুঝতে পারছি! সব সইতে পারি, দাদা, কিন্তু যখন মনে হয়, সব থাকতেও, না খেতে পেয়ে—"

শোভার স্বর রুদ্ধ হইয়া আসিল, দুই চক্ষু জলে ভরিয়া উঠিল। খৃষ্টবাহন ব্যস্ত হইয়া কহিল, "আমি তোমাকে বলছি, শোভা, আর একটি দিন কোন রকমে কাটিয়ে দাও; ওদের দুজনেরই মোহ

কেটে গেছে, তোমারই শাসনে এমন অবস্থায় আমরা ওদের ফিরে পাব, যখন তাদের মধ্যে আর কোন ময়লা থাকবে না, একটি দিনের মত তুমি আর একটু শক্ত হও, বোন্।"

শোভা আত্মসম্বরণ করিয়া কহিল, "তুমি খেয়ে নাও, দাদা। আমার জন্যে ভেব না, তোমার কাছে দুর্ব্বলতাটুকু প্রকাশ করলেও, স্থানবিশেষে একে দমন করবার শিক্ষা আমার জানা আছে, দাদা।"

দুই বন্ধু দুই ঘরে শয্যায় আশ্রয় লইয়াছিল। পরিতৃপ্ত ভোজনের পর খৃষ্টবাহন আরামে নিদ্রা দিয়াছিল। ক্ষুধার তাড়নায় আনন্দমোহনের জঠর জ্বলিতেছিল। শয্যা যেন কাঁটার মত তাহার অঙ্গে বিঁধিতে লাগিল। ক্ষুধার জ্বালা আর সহ্য করিতে না পারিয়া ধীরে ধীরে শয্যা ত্যাগ করিয়া আহার্য্যসন্ধানে চুপি চুপি সে শোভার খাবার ঘরে ঢুকিয়া পড়িল। খুট করিয়া শিকল খোলার শব্দ পাইয়াই শোভা তাড়াতাড়ি ভাঁড়ারের দিকে ছুটিল। দ্বারটির পাশে দাঁড়াইয়া স্তব্ধ হইয়া সে দেখিল, আনন্দমোহন শোভার হাতে প্রস্তুত অপরাহ্নের জন্য রক্ষিত লুচি তরকারীগুলি পরম পরিতৃপ্তির সহিত খাইতে আরম্ভ করিয়াছে। তাড়াতাড়ি উদরপূর্ত্তির জন্য সে কি ব্যগ্রতা,—ভোজনের আনন্দ ও ধরা পড়িবার আতঙ্ক—যুগপৎ এই দুইটি ভাবের সম্পাতে মুখখানি তাহার অনুরঞ্জিত হইয়া উঠিয়াছে।

অপলক দৃষ্টিতে শোভা স্বামীর সেই অপূর্ব্ব ভাবব্যঞ্জক মুখখানির উপর চাহিয়া রহিল। দেখিতে দেখিতে শোভার বিরস মুখখানি হাস্যোজ্জ্বল হইয়া উঠিল, স্বামীর তৃপ্তির সঙ্গে সঙ্গে

মুখখানি তাহার যেমন দৃপ্ত হইল, পরক্ষণে আবার স্বামীর মুখে আতঙ্কের ছায়া দেখিয়া সেও যেন মুসড়াইয়া পড়িল, মুখের হাসি তাহার মুখেই মিলাইয়া গেল—দুই চক্ষু সজল হইয়া উঠিল।

আর ধৈর্য্য ধরিতে না পারিয়া শোভা দরজা ঠেলিয়া ধীরে ধীরে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল। সহসা শোভার আবির্ভাবে আনন্দ মোহন সভয়-বিস্ময়ে একবারে অভিভূত হইয়া গেল। তাহার মুখের খাবার মুখেই রহিল, হাতের খাবার হাত হইতে খসিয়া ঘরের মেঝের উপর পড়িয়া গেল।

শিশিরসিক্ত স্থলপদ্মের মত শোভার সুন্দর মুখখানি টলটল করিতেছিল, দুইটি সজল চক্ষুর অপলক দৃষ্টি—কি মর্ম্মন্তুদ! তাহার ইচ্ছা হইতেছিল, আর্ত্তকণ্ঠের ঝঙ্কার তুলে—একি দুর্ভোগ তোমার!

শোভার মুখের দিকে চাহিতে—তাহার সহিত চোখোচোখি হইতেই আনন্দমোহন অভিভূত হইয়া শোকাবিষ্টের মত কাঁদিয়া ফেলিল। পরক্ষণে শোভার হাত দুটি ধরিয়া অপরাধীর মত আর্ত্তস্বরে সে কহিল, "এতকাল আমি অন্ধ ছিলুম, শোভা, তাই তোমার আসল রূপের সন্ধান পাইনি, তোমাকে চিনতে পারিনি। লিলি আমার চক্ষু ফুটিয়ে দিয়েছে, আমি আজ তোমাকে পরিপূর্ণ-রূপে পেয়েছি; আমাকে দয়া কর, শোভা, সমস্ত পাপ অপরাধ আমার মার্জ্জনা কর—"

শোভা তখন অঞ্চলখানি গলায় দিয়া স্বামীর পদতলে বসিয়া গাঢ়স্বরে কহিল, "তোমাকে শুচি করবার জন্য স্ত্রী হয়েও আমি যেটুকু বাড়াবাড়ি করেছি, তার জন্য ক্ষমা চাইছি।"

আনন্দমোহন আনন্দে অভিভূত হইয়া শোভাকে বক্ষে তুলিয়া লইল।

সন্ধ্যার পর খৃষ্টবাহন সহসা লিলির ঘরে আসিয়া উপস্থিত হইল। লিলি তখন চুপটি করিয়া জানালার ধারে বসিয়াছিল। খৃষ্টবাহনকে দেখিয়া নিতান্ত অপরাধিনীর মত ম্লানমুখে সে উঠিয়া দাঁড়াইল।

খৃষ্টবাহন কহিল, "মিসেস্ দে'র সুব্যবস্থায় আমি ক'দিন পরম তৃপ্তির সঙ্গে খেতে পেয়েছি; কিন্তু মিঃ দে'র মুখে শুনলুম, তুমি ক'দিনই তাকে এক প্রকার অনাহারেই রেখেছ!"

লিলি স্বামীর মুখের দিকে ম্লানদৃষ্টিতে একবার চাহিয়াই মুখখানি নত করিল। খৃষ্টবাহন দৃঢ়স্বরে কহিল, "ভদ্রলোকের ওপর তুমি এ অত্যাচার করেছ কেন, আমি জানতে চাই। আমার ঘরে ত অভাব কিছুই ছিল না!"

লিলি সেইভাবেই দাঁড়াইয়া রহিল, কোনও কথাই কহিল না বা কহিবার সামর্থ্যও তখন তাহার ছিল না। তাহার বিক্ষুব্ধ অন্তর তখন যেন কঠোর শাস্তির জন্য প্রস্তুত হইয়া সাগ্রহে প্রতীক্ষা করিতেছিল!

খৃষ্টবাহন লিলিকে নিরুত্তর দেখিয়া, রুখিয়া তাহার সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইল,—দুই হস্তে স্ত্রীর বাহুমূল ধরিয়া সজোরে প্রবল ঝাঁকানি দিয়া কঠোর স্বরে কহিল, "চুপ ক'রে আছ যে—জবাব দাও!"

অতর্কিতভাবে প্রবল ঝাঁকানি-সংঘাতে মহা আতঙ্কে অভিভূত হইয়া লিলি এবার আর্তস্বরে কহিয়া উঠিল, "এ শাস্তি এতদিন

আমাকে দাও নি কেন তুমি? কেন আমাকে মাথায় তুলে আমাকে এত প্রশ্রয় দিয়েছিলে? আমার ভুল আজ ভেঙে গেছে,—তবু—তবু আমি শাস্তি চাই, আমাকে শাস্তি দাও!—আজ তোমার এই মূর্ত্তি সত্যই আমার চোখে সুন্দর—অতি সুন্দর হয়ে ভাসছে! কেন—এত দিন এ মূর্ত্তি আমাকে দেখাও নি,—তা হ'লে ত এ ভুল আমার হ'ত না!"

সুদীর্ঘ পাঁচটি বৎসরের মধ্যে লিলির সংস্পর্শে আসিয়া লিলির মুখে এমন কথা একটি দিনও শুভ্রবাহন শুনিতে পায় নাই,—এ ভাবে নত হইতে কখনও তাহাকে দেখে নাই! মুগ্ধ হইয়া সে কহিল, "তাই যদি, তা হ'লে আমিও তোমাকে প্রসন্ন মনে ক্ষমা করলুম, লিলি!"

কলহাস্যে ঘরখানি মুখর করিতে করিতে শোভা আসিয়া কহিল, "দাদা, খাবার-দাবার সব তৈরী, আমার বোনটিকে নিয়ে এস, বড় ঘরে ব'সে আজ আমরা সকলে একসঙ্গেই খাব!"

লিলি ঝড়ের মত ছুটিয়া গিয়া শোভাকে জড়াইয়া ধরিয়া কহিল, "তুমিই আমাকে নিয়ে চল, দিদি; আজ থেকে ছায়ার মত আমি তোমার সঙ্গে সঙ্গে ফিরব, ছোট বোনটির মত তোমার কাছে সব শিখব। আমার সমস্ত দোষ ক্ষমা কর, দিদি!"

দুঃখের পাঁচালী

পল্লী-বধূর

এক

অপরাহ্নের প্রান্তভাগে টিপটিপিনী বৃষ্টি মাথায় করিয়া পল্লী বধূ সীমা পল্লীর বিখ্যাত বকুল-পুকুরের ঘাটে নামিল। তাহার এক হাতে ছিল একরাশি বাসন, অপর হাতে কতকগুলি ছাড়া কাপড়। জলের সমীপবর্তী চাতালটির উপর হাতের বাসনগুলি অতি সন্তর্পণে নামাইয়া রাখিয়া, হাতখানি ধুইয়া, কাপড়গুলি জলমগ্ন সোপানে ডুবাইয়া জড় করিল। তাহার পর, একটি পাত্রের ভিতর হইতে তেঁতুল, ঘুঁটের ছাই, ঘাসের নুড়ো প্রভৃতি গৃহস্থ-পরিচিত বস্তুগুলি বাহির করিয়া নিবিষ্টমনে বাসন মাজিতে বসিয়া গেল।

অর্দ্ধসিক্তবসনে আবৃত থাকা সত্ত্বেও এই তরুণীর নিটোল দেহখানি তাহার পরিপুষ্ট স্বাস্থ্য-সম্পদের পরিচয় দিতেছিল, এবং মৌচাকের মত প্রকাণ্ড খোঁপাটির উপর অবগুণ্ঠন উঠিয়া কপোল পর্য্যন্ত অধিকার বিস্তার করিলেও লাবণ্য-মণ্ডিত সপ্রতিভ মুখখানি তাহার সীমার বাহিরে থাকিয়া যেন এই দুর্য্যোগময়ী প্রকৃতিকে ধন্যবাদ দিতেছিল। ধন্যবাদ দিবার কারণ এইটুকু যে, অপরাহ্নে এই পুষ্করিণীর সুদীর্ঘ সোপান-শ্রেণীর উপরিভাগে পথের ধারে বকুল-তলায় বাঁধানো সু-উচ্চ চাতালের উপর পল্লীর মাতব্বরদের যে মজলিস বসে ও নানারূপ আলাপ চলে, তাহাতে ঘাটের চাতালে বসিয়া এমন অসঙ্কোচে ও নিশ্চিন্তমনে নিত্যকার কাজগুলি সম্পন্ন

করা এই বধূটির পক্ষে কিছুতেই সম্ভবপর হইত না,—আবক্ষ অবগুণ্ঠন টানিয়া, বহু বুভুক্ষু দৃষ্টির উপর তাহাকে কর্ত্তব্য পালন করিতে হইত।

ঘাটের চাতালটির উপর বসিয়া সীমা নিপুণ অথচ ক্ষিপ্রহস্তে পরিপাটিরূপে বাসনগুলি মাজিয়া ঘসিয়া ধুইয়া উপরের চাতালটির উপর তুলিয়া রাখিতেছিল,—তাহার অনতিদূরে পুষ্করিণীর তীরভূমি ও জলের কিয়দংশ জুড়িয়া আমগাছের একটা প্রকাণ্ড গুঁড়ি পড়িয়াছিল; তাহারই এক অদৃশ্য কোটরে বসিয়া পল্লীর সবচিন্ ও সার্ব্বজনীন ভূতনী পিসী এই দুর্য্যোগের সুযোগে পরম পরিতৃপ্তির সহিত পল্লীর কোন এক দুঃস্থ পরিবারের জন্য মৎস্য শিকার করিতেছিলেন। তাঁহার হাতে একগাছা ছোট পুঁটুলে-ছিপ, গাছের গুঁড়িতে নারিকেলের মালা-ঢাকা একটা ভাঁড়; বড়শীতে ভাতের চার গাঁথিয়া ফেলিয়া পিসী প্রায় প্রতিটানেই টকাটক্ পুঁটিমাছ ধরিয়া ভাঁড়ে ফেলিতেছিলেন। ছিপের ফাতনাটির উপর তাঁহার দৃষ্টি বিশেষভাবে নিবদ্ধ থাকিলেও, পারিপার্শ্বিক অবস্থা বা অবস্থিতি যে পিসীর সূক্ষ্মদৃষ্টি অতিক্রম করিবার অবকাশ পাইয়াছিল —এ কথা সাহস করিয়া বলা চলে না। কেন না, নিজে অলক্ষ্যে থাকিয়া সীমার উপস্থিতি ও তাহার কার্য্যকলাপ যেমন তিনি লক্ষ্য করিয়াছিলেন,—সীমার অজ্ঞাতসারে অতি সন্তর্পণে ঘাটে অতুলের আবির্ভাব এবং আস্তে আস্তে সিঁড়ি বাহিয়া নামিয়া মধ্যে মাত্র দুইটি চাতালের ব্যবধান রাখিয়া তাহার নির্লজ্জের মত অবস্থান— এই দৃশ্যটিও তাঁহার লক্ষ্যভ্রষ্ট হয় নাই। এমন কি, অতুলের মুখের কদর্য্য হাসিটুকু ও সেই সঙ্গে সিগারেটের ধূম উদ্গীরণের অপূর্ব্ব

ভঙ্গীটিও তাঁহার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি আচ্ছাদন করিতে পারে নাই। ছিপের ফাতনা এবং পুকুরের ঘাট—দুই দিকেই চোখের পাহারা সমানভাবে খাড়া রাখিয়া ভূতনী পিসী যথাস্থানে স্বকার্য্যসাধনে ব্যাপৃত রহিলেন।

ভিজা চাতালটির উপর দুইটি পায়ের ভর দিয়া আলগোছে বসিয়া অতুল সীমাকে লক্ষ্য করিয়া কহিল, "এই বিষ্টি মাথায় ক'রে একলাটি ঘাটে ব'সে বাসন মাজতে লেগে গেছ, বৌদি?"

সীমা চমকিত হইয়া চাহিল। পরিচিত হইলেও, এ সময় অতুলকে এত নিকটে নির্লজ্জের মত বসিতে দেখিয়া তাহার সর্ব্বাঙ্গ জ্বলিয়া উঠিল। জ্বালাময় দৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিয়া শ্লেষের সুরে সে কহিল,—"এ ত আমার চিরদিনের ধরাবাঁধা কাজ, ঝড় হোক, বিষ্টি হোক, বাজ পড়ুক, আমাকে আসতেই হবে। কিন্তু এই দুর্য্যোগ মাথায় ক'রে আপনি এখানে কি মনে ক'রে এসেছেন শুনি?'

মুখবিবর নিঃসৃত সিগারেটের ধূম সবেগে ও সগর্ব্বে সীমার দিকে নিক্ষেপ করিয়া অতুল কহিল,—"এমনই, যাচ্ছিলাম এদিক দিয়ে, ঘাটের দিকে চাইতেই দেখতে পেলাম তোমাকে, তাই—"

সীমা অতুলের দিকে পিছন ফিরিয়া জলে বাসনগুলি ধুইতে ধুইতে কহিল,—"পথ দিয়ে চলতে চলতে মেয়েদের ঘাটের দিকে চাওয়াটা যেমন ভদ্রতা, বউঝিকে একলা ঘাটে দেখে এমন ক'রে অপমান করতে আসাটাও তেমনই সাহসের কথা।"

সীমার সশ্লেষ কথায় কিছুমাত্র অপ্রতিভ না হইয়া অতুল উচ্ছ্বসিতকণ্ঠে কহিয়া উঠিল,—"হুররে! বাঃ—বৌদি, বাঃ!

তোমার কথা শুনে রাগ করব কি, অনুরাগে একবারে মশগুল হয়ে যাচ্ছি। পাবলিক থিয়েটারের কোনও ফাষ্ট ক্লাস অ্যাকট্রেসের চেয়ে কোনো অংশে তুমি খাটো নও, এ কথা আমি হলপ ক'রে বলতে পারি। কিন্তু তোমার কদর কেউ বুঝলে না; তোমার দুঃখের কথা মনে হ'লে আমার বুক ফেটে যায়। তাই না আমি তোমাকে যখন তখন – ”

অতুলের কথায় বাধা দিয়া সীমা দৃপ্তস্বরে কহিল,—“আপনি দয়া ক'রে উঠে যান এখান থেকে। আমার দুঃখের জন্য আপনাকে বুক ফাটাতে হবে না। আমার কোন দুঃখ নেই।”

অতুল তাহার উচ্ছ্বাস আরও উচ্ছল করিয়া বলিল, “দুঃখ নেই তোমার, বৌদি? মিছে কথা বলছ তুমি, আমি কি না জানি। তোমার দজ্জাল শাশুড়ীর অত্যাচার, উঠতে বসতে গালাগাল— দুঃখ নয়? এই কাপড়ের কাঁড়ি আর বাসনের বোঝা নিয়ে পুকুরের ঘাটে এসে বসাকে দুঃখ বলতে চাও না?”

দৃঢ়স্বরে সীমা উত্তর দিল,—“না; আপনি যেগুলোকে দুঃখ বলছেন, ঠাকুরপো, আমি যদি বলি—ও-সবে আমার কোনো কষ্ট নেই। বরং সত্যিকারের কষ্ট যেখানে, তাই আপনি মোচন করতে নিজের বাড়ীতে যান,—তরলার কষ্ট আগে দূর করবার চেষ্টা করুন।”

অতুল ক্ষুব্ধভাবে সীমার দিকে চাহিয়া প্রশ্ন করিল,—“এ কথার মানে? আমার স্ত্রী তরলাকে এর মধ্যে টানবার কারণ? সে কি তোমার মত জীবন্মৃত মনে কর? জান তুমি—আমার মা দিনরাত তার মন যুগিয়ে চলে, শাশুড়ীকে সে-ই দেয় সদাসর্ব্বদা মুখনাড়া, তোমার মতন যন্ত্রণা কোনও দিন সে পায় নি!

তুমি বলছ আমাকে—তার কষ্ট দূর করতে? কি মনে ক'রে এ কথা বললে তুমি?"

সীমা বিদ্যুৎরেখার মত মুখে হাসির একটা ঝিলিক তুলিয়া কহিল,—"এর মানে বোঝবার মত বিদ্যা আপনার ঘটে নেই,—থাকলে আর কথা কইতেন না। তরলাকে জিজ্ঞাসা করবেন, সে এ কথার মানে বুঝিয়ে দেবে।"

"বটে? তা হ'লে যে বিদ্যে তুমি এই ঘাটে ব'সে এমন সাহসের সঙ্গে প্রকাশ করলে, তার কিছু 'পেলা' ত তোমাকে দেওয়া দরকার,—এই নাও!"—বলিয়াই সে দগ্ধাবশিষ্ট সিগারেটটুকু সীমার গণ্ডদেশ লক্ষ্য করিয়া নিক্ষেপ করিল। আহত হইবা মাত্র সীমা ক্ষোভে, রোষে, বিদ্যুৎস্পৃষ্টবৎ সোজা হইয়া দাঁড়াইয়া জ্বলন্ত-দৃষ্টিতে অতুলের দিকে তাকাইল। দগ্ধ সিগারেটের অবশেষটুকু তাহার কোমল গণ্ডে যে দহনজ্বালা তুলিয়াছিল, তাহার শতগুণ জ্বালার পদনখরপ্রান্ত হইতে সীমার মস্তিষ্ক পর্য্যন্ত একটা অব্যক্ত যন্ত্রণার সঞ্চার করিতেছিল।

অতুল উন্মত্তের মত হাসিয়া সীমার আরক্ত মুখখানির দিকে চাহিয়া কহিল,—"সাবাস! কেমন তাগ করেছি—একবারে নিঘাত! ঠিক যায়গাটিতে গিয়ে পড়েছে। আজ এই পর্য্যন্ত বৌদি,—কিন্তু বলে যাচ্ছি—এমন এক দিন আসবে, সে দিন সিগারেট ছুড়ে ফেলতে হবে না এমন ক'রে,—কাছে গিয়ে—"

হঠাৎ জলের ছপ্ ছপ্ শব্দ শুনিয়া অতুল মুখের কথা বন্ধ করিয়া প্রায় পশ্চাতে কিনারার দিকে তাকাইতেই দেখিতে পাইল, ভূতনী পিসী একহাঁটু জল ভাঙিয়া ঘাটের দিকে ধাইয়া

আসিতেছেন। তাঁহার বামহাতে মাছ-ধরা ছিপ! ভয়চকিত-নেত্রে অতুল লক্ষ্য করিল, ছিপখানি চাবুকের মত তুলিয়া ভয়াবহ মূর্ত্তিতে তাহার দিকেই ভ্রূকুটি করিয়া পিসী ছুটিয়া আসিতেছে! শিহরিয়া উঠিয়া অতুল দ্রুতগতিতে সোপানশ্রেণী অতিক্রম করিতে লাগিল।

পিসীর কথায় সীমার চমক ভাঙিল। দেহের সমস্ত রক্ত মাথায় উঠিয়া তাহাকে কিছুক্ষণের জন্য যেন বাহ্যজ্ঞানশূন্য করিয়া দিয়াছিল।

পিসী ঝঙ্কার দিয়া কহিলেন, "পোড়ারমুখো অতলো পালাল যে, জল ভেঙে আসতে হ'ল দেরী, নইলে এই ছিপ-গাছটা ওর পিঠে ভাঙতুম না আজ!"

সীমা পিসীর দিকে চাহিয়া পরক্ষণে দৃষ্টি নত করিয়া হাতের কাযগুলি শেষ করিতে বসিল।

পিসী কিছুক্ষণ স্তব্ধভাবে সে দিকে চাহিয়া রহিলেন, তাহার পর কহিলেন, "আমি সব শুনেছি বাছা, দেখেছিও সব। তোমার সহ্যকেও বলিহারি যাই!"

অশ্রু-উচ্ছ্বসিত মুখখানি তুলিয়া সীমা গাঢ়স্বরে কহিল, "আপনি ত সব জানেন পিসীমা, তবে কেন এ ধিক্কার আমাকে দিচ্ছেন বলুন? আমি—আমি এখানে কি করতে পারি!"

হাতের ছিপখানা সিঁড়ির উপর লাঠির মতন ঠুকিয়া পিসীমা কহিলেন, "কি না করতে পারিস মা? লেখাপড়া শিখিছিস, অনেক কেতাব পড়িছিস, কিন্তু তা থেকে আদায় করেছিস কি? সত্যিকারের বিদ্যে যাদের পেটে থাকে, তাদের পা একটু যদি

কখনও পিছলোয়, ঠিকমত কথার খোঁচা দিলেই তারা যায় শুধরে। কিন্তু এরা যে ইতরোমিতে পেকে উঠেছে গোড়া থেকে, এদের সায়েস্তা করতে হ'লে যে সত্যিকারের খোঁচা দিতে হয় মা, কথার খোঁচায় কিছু হয় না এখানে, বব পাকা পাকা কথা শুনে মুখ-পোড়ার দল আরও পেয়ে বসে। পারিস্ ত, কোমর বাঁধ, আমি তোর পেছনে আছি।"

পিসীব কথাগুলি সীমার আড়ষ্ট দেহখানিকে যেন ফুলাইয়া দিল, দুই চক্ষু তাহার উত্তেজনায় জ্বলিয়া উঠিল। উত্তেজিত চিত্তকে অতিকষ্টে সংযত করিয়া সে উত্তর দিল, "সবই পাবি পিসীমা ; এ শিক্ষাও যে পাইনি, তাও নয় ; রাগ সামলাতে না পেরে লজ্জা-সরম ভুলে খাড়া হয়ে উঠেছিলুম আমি, তাও বোধ হয় দেখে থাকবেন। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে অমনি মনে প'ড়ে যায়—"

সীমার মুখের কথা টানিয়া লইয়া পিসীমা কহিলেন, "তোমার শাশুড়ীর মুখ, তার শাসন ; এই নিয়ে একটা কেলেঙ্কারী ! বুঝি সব, জানি সব। কিন্তু এও জানি মা, অন্যায়ের প্রশ্রয় কখনও দিতে নেই ; দিলেই সে অমনি পেয়ে বসে। যিনিই হোন, অন্যায় কিছু করলেই, করবে তার প্রতিবাদ। তা যদি করতে, আজ এই অনামুখো অতলো এরকম ক'রে তোমার অপমান করতে পারত ?"

সীমার দুই চক্ষু তখনও জ্বলিতেছিল, শেষের কথায় সেই সঙ্গে তাহার সর্ব্বাঙ্গে আবার বিষের জ্বালা ধরিল। সে তখন নির্ব্বাক্ নয়নে এই স্পষ্টবাদিনী পল্লীর বিভীষিকা স্বরূপ পিসীমার দৃপ্ত মুখখানির দিকে তাকাইয়া রহিল।

পিসীমা কহিলেন, "সেই মুখপোড়া ছোঁড়ার এত বড় আস্পর্দ্ধা,

পোড়া সিগারেট ছুড়ে তোর মুখে ছ্যাঁকা দিয়েছে, এ অপমান তুই সইবি কি ক'রে? সইতে পারবি? এর প্রতিশোধ নিতে প্রবৃত্তি হচ্ছে না তোর, সীমা? শুধু কি কথা ছুড়তেই পারিস, আর কিছু নয়?"

সীমা হেঁট হইয়া পিসীমার সিক্ত পদতল স্পর্শ করিয়া কহিল, "আপনি আজ আমাকে নূতন শিক্ষা দিলেন পিসীমা, আমি ভুলব না; এর পরীক্ষা খুব শীঘ্রই আমি দেব, পিসীমা। তখন কিন্তু আমাকে দেখবেন।"

পিসীমা তাঁহার দৃঢ়হস্তের দুইটি অঙ্গুলি দিয়া সস্নেহে সীমার চিবুক স্পর্শ করিয়া কহিলেন,—"যে দেখবার, সেই দেখবে, তার জন্যে ভাবতে হয় না। আজ তোর এই লাঞ্ছনা দেখে গেলুম, মুখ বুজে থাকব, কাউকে বলব না, যে দিন এই লাঞ্ছনার শোধ তুলতে পারবি, সেই দিন তোকে বুকে জড়িয়ে ধ'রে আশীর্ব্বাদ করব আমি—এ কথা মনে রাখিস, সীমা।"

দুই

খিদিরপুরের কোনও প্রাচীন রক্ষণশীল একান্নবর্ত্তী বর্দ্ধিষ্ণু পরিবারের মধ্যে সীমার শৈশব ও কৈশোর জীবন অতিবাহিত হয়। সহরের নানাবিধ নেত্রসুখকর আবেষ্টনের মধ্যে প্রতিপালিত হইয়াও সীমা পল্লী-সমাজের ঘাতপ্রতিঘাতপূর্ণ জীবনযাত্রার সহিত পরিচিত হইবার অবকাশ পাইয়াছিল। এই বৃহৎ পরিবারের অনেকগুলি

কন্যাই সহরের পৈতৃক খেলাঘরের খেলা শেষ করিয়া বেহালা, আরিয়াদহ, পূর্ব্ব-নপাড়া, জনাই, বালি, জয়নগর প্রভৃতি সমাজ-শাসিত প্রসিদ্ধ পল্লীসমূহেই চিরজীবনের খেলাঘর পাতিয়া বসিয়াছিল। এই সূত্রে সীমা একাধিকবার সকল ভগিনীর সংসার দেখিয়া, পল্লী জীবনের সামাজিক অভিজ্ঞতা কিছু কিছু সঞ্চয়ও করিয়াছিল। সুতরাং যথাকালে এমনই এক পল্লীভবনে গিয়া সংসার পাতিবার ডাক যখন তাহার উপর আসিয়াছিল, সে কিছুমাত্র বিমর্ষ বা বিভীষিকা গ্রস্ত হয় নাই।

সীমার পিতা পীতাম্বর চট্টোপাধ্যায় সহরের ভূষণ স্বরূপ ছিলেন। তাঁহার অমায়িক ব্যবহার, আচার-নিষ্ঠা ও সত্যবাদিতা আদর্শ স্থানীয় ছিল। লোকের উপকার করিবার সময় তিনি যেমন আপনার স্বার্থের দিকে দৃষ্টি রাখিতেন না, অতি বড় অপকারীর অপকারচিন্তাও তেমনই মনে স্থান দিতেন না। ইতর ভদ্র সকলেই চট্টোপাধ্যায় মহাশয়কে দেবতার মত ভক্তি করিত। এত বড় একান্নবর্ত্তী সংসারটির ইনিই ছিলেন পরিচালক। অনুজ ভ্রাতারা আজ্ঞাবহ ভৃত্যের মত তাঁহার আদেশ মানিয়া চলিতেন।

কিন্তু একটি বিষয়ে চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের একটু দুর্ব্বলতা দেখা যাইত যে, কেহ অন্যায় করিলেও তিনি তিরস্কার করিতে পারিতেন না। কাহারও দোষ দেখাইয়া দিয়া তাহাকে লজ্জা দিতেও তিনি সঙ্কুচিত হইতেন। এ বিষয়ে তাঁহার সহধর্ম্মিণী সর্ব্বদাই তাঁহাকে সচেতন করিয়া দিতেন। কিন্তু তাঁহার সাবধানতা অধিকাংশ স্থলেই ব্যর্থ হইয়া যাইত। চট্টোপাধ্যায়-গৃহিণী দেবতুল্য স্বামীর সকল সদ্গুণের অধিকারিণী হইলেও, তাঁহার প্রকৃতিগত

দুর্ব্বলতার একান্ত বিরোধী ছিলেন। কেহ কোন অন্যায় করিলে, তিনি কিছুতেই তাহা সহ্য করিয়া চুপ করিয়া থাকিতে পারিতেন না, সঙ্গে সঙ্গে উচিত কথা শুনাইয়া দিতেন। এজন্য এই বৃহৎ সংসারে সকলেই তাঁহাকে ভয় করিয়া চলিত; স্পষ্টবক্তা বলিয়া তিনি একটা খ্যাতিলাভও করিয়াছিলেন। পিতার সাধুতা ও মাতার স্পষ্টবাদিতা শৈশব হইতেই সীমার সরল প্রকৃতির উপর প্রতিফলিত হইয়াছিল। শুধু ইহাই নহে, মায়ের নিপুণহস্তের গৃহস্থালীর যাবতীয় কাযকর্ম্ম সে এমন দক্ষতার সহিত আয়ত্ত করিয়া লইয়াছিল যে, তাহার বিবাহের পূর্ব্বেই বাড়ীর সকলেই বলাবলি করিতেন,—'শ্বশুরবাড়ী গিয়ে সীমাই সব মেয়ের চেয়ে বেশী নাম নেবে; যত বড় দজ্জাল শাশুড়ী হোক্ না কেন, সীমার কায দেখে—গতর দেখে ধন্যি ধন্যি করবে।'

এই বৃহৎ পরিবারের এক পাল মেয়ের বিবাহ যথাযোগ্য বয়সেই হইয়াছিল; পাত্রসংগ্রহে কোনও ক্ষেত্রেই বিড়ম্বনা ভোগ করিতে হয় নাই। কিন্তু সর্ব্বগুণবতী সীমার বর স্থির করিতেই যেখানকার যত বাধা-বিঘ্ন প্রতিবন্ধক যেন যোট বাঁধিয়া দেখা দিল। নির্ব্বাচিত পাত্রপক্ষের একটা না-একটা খুঁত বাহির হইয়া সম্বন্ধ ভাঙিয়া দিতে লাগিল। এইরূপ অনিবার্য্য প্রতিবন্ধকতায় বৎসরের পর বৎসর যেমন অতীত হইয়া সীমার বিবাহের বয়সের সীমা অতিক্রম করিতেছিল, পক্ষান্তরে বিদ্যা, শিল্প ও সাংসারিক যাবতীয় শিক্ষা সম্বন্ধে তাহার পটুতা ও অভিজ্ঞতা দৃঢ়তর হইতেছিল।

বহু অনুসন্ধানের পর, খিদিরপুর হইতে কয়েক ক্রোশ দূরে অবস্থিত মহেশখালী নামে কুলীনপ্রধান এক বর্দ্ধিষ্ণু গণ্ডগ্রামে

সীমার সংসার পাতিবার বিধি-ব্যবস্থা স্থির হইয়া গেল। পাত্রটি কোনও প্রসিদ্ধ সওদাগরি আফিসে পঞ্চাশ টাকা মাহিনার চাকুরে, সংসারে পরিবারের মধ্যে পাত্রের মা এবং সেই মায়ের মা মাত্র বিদ্যমান, দুইটিমাত্র ভগিনী, তাহারাও পাত্রস্থা হইয়া স্বামীর সংসার অধিকার করিয়াছে অনেক দিন। পাকা বাড়ী এবং কিছু জমি-জমাও আছে। সর্ব্বোপরি—পাত্রের কৌলীন্যের মর্য্যাদাটুকু একবারে কানায় কানায় ভরপুর ছিল, তাহার একটি কোণও কোনপ্রকারে খালি হয় নাই বা ভাণ্ডারজাত কুলরত্ন সম্পূর্ণ নিঁখুত হইয়াই ছিল—কোথাও এতটুকু দাগ ধরে নাই।—রক্ষণশীল চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের এই পাত্র সম্বন্ধে ইহাই ছিল সব চেয়ে শান্তি, তৃপ্তি ও সান্ত্বনার বিষয়। এমন কি, দেখাশুনার পর উপযাচক হইয়া মহেশথালীর কোনও পরিচিত অধিবাসী চট্টোপাধ্যায় মহাশয়কে নিভৃতে ডাকিয়া বলিয়াছিলেন,—"এ ঘরে দেওয়া, আর মেয়ের হাত পা বেধে জলে ফেলে দেওয়া সমান কথা, চাটুয্যে মশাই!"

চট্টোপাধ্যায় মহাশয় এ কথা শুনিয়া সবিস্ময়ে প্রশ্ন করিয়াছিলেন,—"কেন বলুন ত?"

হিতৈষী হাসিয়া উত্তর দিয়াছিলেন,—"কুলীনের ঘরে সাতাশ বছরের আইবুড়ো ছেলে দেখেও কিছু বুঝতে পারেন নি, মশাই? ছেলে ভাল, সংস্থানও নেহাৎ মন্দ নয়, ঘর-বাড়ী জমি-জেরাৎ আছে, এ সবই ভাল বলতে হবে। কিন্তু নির্ঘাত হচ্ছে—ঐ জোড়া মা!"

—"জোড়া মা? বুঝতে পারছি না ত!"

—"বুঝতে পারছেন না? কিন্তু এইটিই আগে বোঝা উচিত ছিল, চাটুয্যে মশাই। ছেলের মা, আবার সেই মায়ের মা!—সারা মহেশখালী এদের নামে কাঁপে! মেয়ের বর—জামাই, তাদেরই ধ'রে ধ'রে ঠেঙিয়ে দেয়—এমন চীজ এরা দুটি!—এ ত ছেলের বউ,—আস্ত রাখবে না! মা যদি ভাঁজেন মুগুর, তস্য মা ভাঁজবেন দুর্ম্মুস; মা রেগে মারবার জন্যে জাঁতি তুললে, তস্য মা সঙ্গে সঙ্গে বুকের ওপর জাঁতা ঘুরিয়ে দেবেন! বড় কঠিন ঠাঁই চাটুয্যে মশাই, যাকে বলে—একা রামে রক্ষে নেই সুগ্রীব দোসর; এও তাই! খুব বুঝে সুঝে এ ঘরে মেয়ে পাঠাবেন ব'লে রাখলুম।"

কিন্তু সত্যনিষ্ঠ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় তখন কথা দিয়াছিলেন। ব্রহ্মাণ্ড ওলট-পালট হইলেও মুখের কথা তিনি ফিরাইয়া লইতেন না। বিশেষতঃ পল্লীর যে হিতৈষীটি উপযাচক হইয়া তাঁহাকে এতগুলি কথা শুনাইতে আসিয়াছিল, সকলের অসাক্ষাতে নিভৃতে ডাকিয়া শুধু তাঁহারই নিকট ব্যক্ত করাতে তিনি কথাগুলির গুরুত্ব উপলব্ধি করেন নাই। মনে মনে ভাবিয়াছিলেন, ছেলের বয়স হইয়াছে সত্য, কিন্তু তাঁহার কন্যা? সে'ও যে কৈশোর অতিক্রম করিয়া যৌবনের পথে পদার্পণ করিয়াছে। আর শাশুড়ীর অত্যাচার? সে কোন্ সংসারে না ঘটে? বিশেষতঃ সীমা সাংসারিক কাযকর্ম্মে যেমন পারদর্শিনী হইয়া উঠিয়াছে, তাহাতে যে-কোন সংসার সে একাই চালাইয়া লইতে পারে; এ অবস্থায় কি অপরাধে শাশুড়ী অত্যাচার করিবে? সীমা যে সকলকে মানাইয়া লইতে শিখিয়াছে, তাহার ব্যবহারে সকলেই মুগ্ধ হইয়া যায়, শ্বশুরবাড়ীতে তাহার লাঞ্ছনা অসম্ভব।

চট্টোপাধ্যায় মহাশয় মনে মনে যখন সীমার শ্বশুরবাড়ী ও তাহার সংসার সম্বন্ধে এই সকল চিন্তা করিতেছিলেন, ভবিতব্য বুঝি তখন অলক্ষ্যে থাকিয়া হাসিয়াছিলেন! বিবাহের পর বৎসর ঘুরিতে না ঘুরিতে, শ্বশুরবাড়ী সম্বন্ধে সীমা কোনও কাহিনী বিশেষভাবে ব্যক্ত না করিলেও, কা ঘুসায় প্রকাশ হইয়া পড়িল যে, পাত্র-দেখা-শুনার সময়—মহেশখালীর সেই লোকটি উপযাচক হইয়া যে সকল কথা শুনাইয়াছিল, তাহা ভিত্তিহীন নহে।

বিদ্যার অতি বিদ্যা যেমন গুণ হইয়াও দোষে দাঁড়াইয়াছিল, তেমনই সীমার শিক্ষা ও অভিজ্ঞতালব্ধ গুণগুলিও একে একে তাহার শাশুড়ী ও শাশুড়ী-জননী দিদি-শাশুড়ীর নিকট নানাবিধ দোষের কারণ হইয়া দাঁড়াইল।

প্রথম ঘরবসত করিতে আসিয়াই আচার-ব্যবহার, কথাবার্ত্তা ও চালচলনে সীমা যে বৈশিষ্ট্যের পরিচয় দিয়াছিল, তাহা গণ্ডগ্রাম মহেশখালীতে নূতন। গ্রামের মেয়েরা অবাক্ হইয়া তাহার দিকে তাকাইয়া থাকিত। রাজনীতি, সমাজ, ধর্ম্ম, সাহিত্য, শিল্প সম্বন্ধে সীমার স্বচ্ছ মতামত শুনিয়া পল্লীর ফ্যাসানবিলাসিনী তরুণীরাও অবাক্ হইয়া যাইত। এ পর্য্যন্ত এই ধারণাই তাহাদের মনে বদ্ধমূল ছিল যে, বসনে-ভূষণে নূতনত্ব দেখাইয়া পল্লীর সমবয়সী নারীসমাজে একটা আন্দোলন তোলাই মেয়েদের উঁচুদরের কৃতিত্ব। কিন্তু সীমার কথাবার্ত্তা শুনিয়া তাহারা প্রথম বুঝিল যে, কৃতিত্ব-প্রকাশের অন্য পথও আছে—সে পথে দাঁড়াইয়া প্রতিষ্ঠা লইতে পয়সা খরচ করিয়া কাপড় গহনা খরিদ করিতে হয় না,—কঠোর সাধনায় তাহা আয়ত্ত করিতে হয়। বড় বড় উপন্যাস-পাঠের নেশা

যে সকল তরুণীকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিত, তাহারা সীমাকে দেখিয়া, তাহার কথা শুনিয়া, মনে মনে ভাবিতে আরম্ভ করিল—বইয়ে তাহারা যে সব মেয়ের কথা পড়ে, সীমা বুঝি তাহাদেরই এক জন।

কিন্তু সীমার শাশুড়ী বিশ্বেশ্বরী বয়স্থা বধূর এ সকল কৃতিত্ব কিছুতেই বরদাস্ত করিতে পারিলেন না। সীমার কথাবার্ত্তার ভঙ্গী একটু অসাধারণ ছিল এবং তাহার ভাষা এমন মার্জ্জিত ও বিশুদ্ধভাবে উচ্চারিত হইত যে, পল্লীর শিক্ষাভিমানী পুরুষদের মুখেও তেমনটি শুনিতে পাওয়া যাইত না। সুতরাং বধূর এ স্পর্দ্ধা বিশ্বেশ্বরীর অসহ্য হইয়া উঠিয়াছিল। সীমার মুখে উচ্চগ্রামের কথা কিছু শুনিলেই তিনি নাসিকা সঙ্কুচিত ও মুখখান বিকৃত করিয়া কহিতেন, "ও সব সহুরে ঢঙ্ ভুলে যাও, বাছা; এসেছ পাড়াগাঁয়ে গেরস্তর ঘর করতে, এখানে ও-সব চল্‌বে না।"

দিদিশাশুড়ী এলোকেশী সঙ্গে সঙ্গে রসান দিয়া বলিয়া উঠিতেন,—"নাত বউ কথা কইলে মনে হয়, বুঝি থ্যাটার (থিয়েটার) করছে!"

সকল বিষয়েই পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার দিকে সীমার বিশেষ লক্ষ্য ছিল এবং ছেলেবেলা হইতেই এ সম্বন্ধে সে শিক্ষা পাইয়াছিল। শাশুড়ী বিশ্বেশ্বরীর খর দৃষ্টিতে ইহাও দোষ বলিয়া গণ্য হইল। "গেরস্তর বাড়ী, এখানে অত পিটপিটিনি কেন? এ কি হাসপাতাল, না, ডাক্তারখানা—যে একটু কিছু হ'লেই ফ্যানালিন (ফিনাইল) ছড়াতে হবে? ধোপার খরচই বা এত কেন বাছা? যোগাবে কে শুনি? আর হুট্ বল্‌তে নতুন কাপড় পাট্ ভেঙে

পরা আমরা দুচক্ষে দেখ্‌তে পারি না; কেন? ময়লা কাপড় পরলে সোণার অঙ্গ কি কালি হয়ে যায়? এ সব হচ্ছে সহুরে বিবিয়ানা, এখানে ওসব আধিক্যেতা চল্‌বে না, বাঁছা!"

এ বাড়ীর কয়টি প্রাণীর প্রকৃতির পরিচয় পাইতে বুদ্ধিমতী সীমার বিলম্ব হয় নাই। শাশুড়ী দিদিশাশুড়ী যে একই তারে বাঁধা পুতুলবিশেষ,—একটির উপর টান পড়িলে অন্যটিও সঙ্গে সঙ্গে নড়িয়া উঠিবে, একটি নাচিলে অপরটিও নাচিতে পাদুখানি তুলিবে, তাহা সে বুঝিয়াছিল। মা ও মেয়ে দুই জনেরই অখণ্ড বিশ্বাস, তাহাদের মত আলাপী, তাহাদের মত পাকা গৃহিণী, তাহাদের মত গৃহস্থালী সকল কর্ম্মেই পটীয়সী—বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে আর কেহ নাই। তথাপি, মহেশখালীর প্রত্যেক বাড়ীর মেয়েরা এমন হিংসুটে যে, তাহাদের সুখ্যাতি কাহারও মুখে আসে না। অথচ বধূ সীমা এ বাড়ীতে পা দিতে না দিতেই তাহার সুখ্যাতি কাহারও মুখে বুঝি আর ধরে না—পাড়াশুদ্ধ মেয়ের মুখ দিয়া সীমার নাম উঠিতেই যেন লাল পড়ে। ইহা কি শাশুড়ী দিদিশাশুড়ীর প্রাণে সহ্য হইতে পারে? বধূ আসিয়া তাহাদের মুখ পুড়াইয়া দেয়? তাহাদের দেখিলে পাড়ার মেয়েরা পাশ কাটাইয়া পালায়, আর বধূর সঙ্গে আলাপ করিতে বাড়ীতে মেয়ে আর ধরে না! এমন অনৈসরণ কি দেখা যায় গা?

তাহার পর, সীমার স্বামী গোবর্দ্ধন,—তাহারও আস্পর্দ্ধা কি কম! মা আর দিদিমা বৈ যে আর কাহাকেও জানিত না,—পাড়ার কাহারও সহিত মিশিতে চাহিত না, সারাদিনের খাটুনির পর, মা ও দিদিমার কোলের কাছে বসিয়া যে তৃপ্তি পাইত,

আফিসের কত কথাই বলিত; যাহা কিছু আব্দার—তাহা অসঙ্কোচে প্রকাশ করিয়া নিজে যেমন সুখী হইত, মা ও দিদিমাকেও সেই পরিমাণে আনন্দ দিত,—কি সুখের দিনই না তাহাদের ছিল!—কিন্তু এখন?—ছেলে আফিস হইতে আসিয়াই নিজের ঘরে আশ্রয় লয়,—সর্ব্বাগ্রে চায় এখন সীমার সঙ্গ! মা-দিদিমার কাছে আর তেমন করিয়া ছুটিয়া আসে না, কাছে বসিয়া গল্প করে না, এটা খাব, ওটা খাব বলিয়া আব্দার তুলে না!—এই যে আকস্মিক ব্যবধান, কে—কে ইহার জন্য দায়ী বল ত? বধূ সীমা সহসা এ সংসারে আসিয়া—মাতা-পুত্রের মধ্যস্থলে ব্যবধানের এই প্রাচীর তুলিয়া দেয় নাই কি? বধূর এ স্পর্দ্ধা কি বিশ্বেশ্বরীর মত মাতা সহ্য করিতে পারে? তোমরাই বল না!

গোবর্দ্ধন যদিও তাহার পরিচিত বন্ধুদের মধ্যে এবং পাড়ার প্রত্যেকেরই নিকট 'গোবর-গণেশ' বলিয়া অভিহিত হইয়া আসিয়াছে, কিন্তু সীমা তাহার এই নিরীহ ও অল্পভাষী স্বামীটিকে প্রীতির দৃষ্টিতে দেখিয়া সহানুভূতির সহিত হৃদয়মন্দিরে বরণ করিয়া লইয়াছিল। এই নির্ঝঞ্ঝাট মানুষটির অসীম ধৈর্য্য ও সহনশীলতার পরিচয় পাইয়া সীমা চমৎকৃত হইয়া গিয়াছিল। সে বিশেষভাবেই লক্ষ্য করিয়াছিল, তাহার সম্বন্ধে তাহার স্বামীর মনে কোনও বিরাগ বা কিছুমাত্র অভিযোগ যেমন নাই, তাহার বিরুদ্ধে মায়ের বিকৃত মনোভাব সম্বন্ধেও তেমনই কোনও প্রতিবাদ করিবার সামর্থ্যও তাহার নাই। সীমাকে একান্তে পাইয়াও সে যেমন চিরসঞ্চিত মাতৃভক্তির একটুও অপচয় করে নাই, সহধর্ম্মিণীর প্রতি যথাযোগ্য স্নেহ প্রকাশেও তেমনই উদাসীন নহে।

আফিস হইতে আসিয়া যদিও গোবর্দ্ধন নিজ কক্ষে সীমার সঙ্গই সর্ব্বাগ্রে কামনা করিত, কিন্তু অনতিবিলম্বে মা ও দিদিমার পদপ্রান্তে বসিয়া শ্রদ্ধা-নিবেদনেও তাহাকে চির অভ্যস্ত দেখা যাইত। অবশ্য, মায়ের চিত্ত তাহাতে যে উৎফুল্ল হইয়া উঠিত, তাহা বলা চলে না—বরং একটা অভিমান প্রচ্ছন্নভাবে মাতৃহৃদয় আচ্ছন্ন করিত এবং তাহাই ক্রমশঃ দ্বেষ ও রোষে পরিণত হইয়া সীমার অদৃষ্ট অন্ধকার করিয়া তুলিত।

সকলের প্রকৃতি পুস্তকের মত পাঠ করিয়া সীমা প্রত্যেকেরই মন রাখিয়া যতদূর সম্ভব দক্ষতার সহিত তাহার কর্ত্তব্যপালনে প্রবৃত্ত হইয়াছিল,—কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে সকল প্রচেষ্টাই তাহার ব্যর্থ হইয়া গেল! একটি দিনের জন্য সে তাহার শাশুড়ী বা দিদি-শাশুড়ীর মন পাইল না। যে কাযটি সে ভাল ভাবিয়া করিত, তাহা লইয়াই তাহার উপর শাশুড়ীর গঞ্জনা আরম্ভ হইত। অথচ, সীমা সুস্থ শরীরকে এভাবে ব্যস্ত করিবার এবং সংসারের শান্তির উপর অনর্থক অশান্তিকে ডাকিয়া আনিবার কারণ বুঝিতে পারিত না। এক এক সময় সে প্রতিবাদ যে না করিত, তাহা নহে; কিন্তু তাহার ফল বিপরীত হইয়া দাঁড়াইত,—এমন সব অকথা-কুকথা তাহার উপর বর্ষিত হইত, যাহার সহিত সে কোনও দিনই পরিচিত নহে। সর্ব্বাপেক্ষা তাহার মনে বেশী আঘাত লাগিত, যে দিন তাহার মিষ্টভাষিণী শাশুড়ী ও দিদি-শাশুড়ী তারস্বরে নানা অশ্রাব্য গালি-গালাজের সঙ্গে তাহার প্রাতঃস্মরণীয় পিতাকেও আক্রমণ করিতে দ্বিধা করিতেন না!—অনশনে ও অবিশ্রান্ত রোদনের ভিতর দিয়াই সে দিন তাহার কাটিয়া যাইত!

শাশুড়ী বিশ্বেশ্বরীর দাপটে পাড়ার সমবয়সী মেয়েদের এ বাড়ীতে আসা যখন বন্ধ হইয়া গেল, তখন হঠাৎ এক দিন অতুলের আবির্ভাব হইল। অতুল বিশ্বেশ্বরীর পিসতুতো ভাইয়ের ছেলে। পাড়ার মধ্যে এই ছেলেটিই বিশ্বেশ্বরীর স্নেহ আকর্ষণ করিতে পারিয়াছিল,—অথচ, পাড়ার সকলেই ইহাকে বিষনেত্রে দেখিত, মেয়েরা ইহাকে দূর হইতে দেখিলেই ঘোমটা টানিয়া আত্মগোপন করিতে ব্যাকুল হইয়া উঠিত।

অতুলের স্ত্রী তরলার সহিত সীমার পরিচয় হইয়াছিল। সে নিজেই স্বামীর কুচরিত্র সম্বন্ধে কত কথাই বলিত, নিজের অদৃষ্টের নিন্দা করিত। অতুলকে দেখিয়াই সীমা ঘোমটা টানিয়া দিয়াছিল ;—এই তাহার অপরাধ।

সীমার এই অতি লজ্জা আজ যেন বিশ্বেশ্বরীকে ক্ষিপ্ত করিয়া তুলিল। তর্জ্জন করিয়া সে বলিয়া উঠিল,—"ইস্, লজ্জা দেখে যে আর বাঁচি না! ভগিনীপোতরা দেখা করতে এলে, তখন ত সংজ্ঞে হারিয়ে ব'স—গল্প আর ফুরোয় না,—যত লজ্জা বুঝি আমার ভাইপোর কাছে? আজ যেন কপালগুণে সব ছট্‌কে পড়েছি, নইলে ত একত্তর থাক্‌বার কথা,—দেওরকে দেখে আর লজ্জায় আধ হাত ঘোমটা টান্‌তে হবে না—ঢং দেখে আর বাঁচি না!"

উত্তরসাধিকা দিদিশাশুড়ী অমনি সানায়ের পোঁ ধরার মত হাত-মুখ নাড়িয়া সুর করিয়া রসান দিল,—"রাই আমাদের নজ্জাবতী নতা! আড়াল পেলেই ঘোমটা তুলে নাচেন তখন থ্যামটা!"

যদিও সেদিন সীমা এই সব অবান্তর মন্তব্য শুনিয়াও অবগুণ্ঠন

মোচন করে নাই, বা শাশুড়ীর পীড়াপীড়ি স্বত্বেও অতুলের সঙ্গে কথা কহে নাই; কিন্তু এ সঙ্কল্প সে বেশী দিন বজায় রাখিতে পারে নাই। যে বিষয়টির জন্য সীমার জেদ দেখা যাইত, সেই জেদটিকেই ভাঙ্গিয়া দিয়া সীমাকে খাটো করাই বিশ্বেশ্বরীর দৃঢ়তর লক্ষ্য ছিল। সুতরাং সেই দিনটি ·ইতে নিতাই যখন এ বাড়ীতে অতুলেব যাতায়াত অনিবার্য্য হইয়া উঠিল, তখন শাশুড়ীর জেদ রক্ষা করিতে সীমাকে নিজের জেদ ভাঙিতে হইল। অর্থাৎ, তাহাকে মাথার অবগুণ্ঠন খসাইতে হইল এবং অতুলের সঙ্গে কথা কহিতেও হইল।

এই অধিকার পাইয়া ক্রমে অতুল যে স্পর্দ্ধার পরিচয় দেয়, বকুলপুকুরের ঘাটে দুর্য্যোগময় সায়াহ্নে আমরা তাহা প্রত্যক্ষ করিয়াছি।

তিন

পুকুরঘাট হইতে সীমা যখন বাড়ীতে ফিরিয়া আসিল, তখন সবে মাত্র সন্ধ্যা হইয়াছে। বিশ্বেশ্বরী সীমার বিলম্বে ধৈর্য্য হারাইয়া তাহার উদ্দেশে নিজের স্বভাবসিদ্ধ ভাষায় পুবীষ-প্রবাহ ছড়াইতে ছড়াইতে সবে মাত্র সন্ধ্যার প্রদীপটিতে অগ্নি-সংযোগ করিয়াছে; সীমাকে দেখিযাই একবারে মারমুখী হইয়া তাহার সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইল।

পূর্ণ তিনটি বৎসর একাদিক্রমে সমানভাবে সকল অত্যাচার সহ্য করিয়া, লাঞ্ছনা, গঞ্জনা, পীড়ন, নির্য্যাতন দৈনন্দিন ভূষণ

করিয়া লইয়া, নিজের সহজাত তেজস্বিতা, স্পষ্টবাদিতা, শক্তি, সামর্থ্য, জেদ ও সাহসিকতা সমস্তই নির্ব্বিচারে এই সংসারের যূপ-মূলে বলি দিয়া, সকল দিকে সকল রকমেই সীমা আপনাকে রিক্তা মনে করিয়া বেশ নিশ্চিন্ত হইয়াই ছিল। কারণে অকারণে শাশুড়ী-দিদিশাশুড়ীর নির্ম্মম পীড়ন আরম্ভ হইলে, সে মুখটি বুজিয়া সহ্য করিয়াছে; আচাল-পচাল অশ্লীল গালি-গালাজ, যাহা তাহার শ্রুতিস্পর্শ হইলেও সে শিহরিয়া উঠিত—দুই চক্ষুতে জ্বালা ধরিত, তাহাও নির্ব্বিকারভাবে শুনিতে অভ্যস্ত হইয়া গিয়াছে; পিতা-মাতার সম্বন্ধে উঁচু কথাটি কানে বাজিলে প্রথম প্রথম সে মনে করিত, দুই কানের ভিতর যেন কোনও জ্বালাময় উত্তপ্ত দ্রাবক প্রবেশ করিতেছে, এখন সদাসর্ব্বদা পিত্রালয় ও পিতা-মাতা সম্বন্ধে নানা কদর্য্য গালিগালাজ শুনিয়াও সে পাষাণের মত নিথর হইয়া এই সংসার মাথায় করিয়া চলিয়াছে; কোনও প্রতিবাদ করে নাই, স্বামীর কাছে একটি দিনের জন্যও কোনও অভিযোগ তুলে নাই, একটিবারও সে মাথা তুলিয়া দাঁড়ায় নাই। কিন্তু আজ?

সুক্ষণে কি কুক্ষণে কে জানে, বকুলপুকুরের ঘাটে স্পর্দ্ধিত বর্ব্বরের সেই নিষ্করুণ আচরণ, তাহার নিষ্ঠুর হস্ত নিক্ষিপ্ত দগ্ধ সিগারেটের অপবিত্র জ্বালাময় স্পর্শ আজ বুঝি আত্ম-বিস্মৃত সীমার স্বভাব-বিরুদ্ধ সহন-শীলতা, ধৈর্য্য ও তিতিক্ষার বন্ধন ভস্ম করিয়া দিয়া সীমার দেহে মনে সত্যিকারের সম্বিৎসঞ্চার করিয়াছে; তাহারই প্রভাবে তাহার উদ্বেলিত-চিত্তে আজ এই প্রশ্ন স্বভাবতই উঠিয়াছে, সে কোথায় চলিয়াছে, অন্ধের মত অসহায়ভাবে, মুক্তির পথে? না মৃত্যুর দিকে?

ঠিক সময়েই ভূতিনী পিসী তাহার সংশয়ের বুঝি সমাধান করিতেই আসিয়াছিলেন। তিনি জানাইয়া দিলেন—মৃত্যুর পথেই ত সে চলিয়াছে! অন্যায়ের প্রশ্রয় কি কখনও দিতে আছে?

সীমা আজ বুঝিয়াছে, সত্যই ত সে এত দিন ভুলের পথেই তাহার যাত্রা আরম্ভ করিয়াছিল। তিনটি বৎসর ত সে সবই সহ্য করিয়াছে, কিন্তু তাহার ফলে সে পাইয়াছে কি? অত্যাচার ক্রমশঃই প্রবাহের পর প্রবাহ তুলিয়া তাহার দেহ ও মনের উপর দিয়া ছুটিয়া চলিয়াছে! যে শেষ লাঞ্ছনাটুকু অবশিষ্ট ছিল, যাহার কথা সে কোনও দিন কল্পনাও করে নাই—তাহাই এবার ভ্রূকুটি করিয়া দেখা দিয়াছে! কিন্তু ইহার জন্য দায়ী কে?—কথাটা মনে উঠিতেই সর্ব্বশরীর তাহার জ্বালা করিয়া উঠিল। কি করিয়া যে পিচ্ছিল পথটুকু অতিক্রম করিয়া সে বাড়ীতে ঢুকিয়াছিল, সে বুঝি নিজেই তাহা জানে না; যেন কি একটা প্রবল প্রেরণা—অস্বাভাবিক উত্তেজনার আবেগে তাহাকে টানিয়া আনিয়াছিল।

বিশ্বেশ্বরী যখন মারমুখী হইয়া সীমার সম্মুখে ছুটিয়া গিয়া হুঙ্কার তুলিয়া কহিল,—"এতক্ষণ কি হচ্ছিল ঘাটে হারামজাদী?—বাপের বাড়ীর কোন্ পীরিতের কানাই ইয়ারকী দিতে এসেছিল, শুনি?"

অন্যদিন হইলে সীমা মুখটি নীচু করিয়া নিরুত্তরে হাতের জিনিসগুলি সামলাইয়া রাখিত—এত বড় ইতর গালাগালও সে পরিপাক করিতে দ্বিধা করিত না। কিন্তু আজ তাহার মাথার ভিতর আগুন জ্বলিতেছিল, জ্বলন্ত দৃষ্টিতে শাশুড়ীর মুখের দিকে তাকাইয়া সে আজ উত্তর দিল,—"আমার বাপের-বাড়ীর কেউ এ দুর্য্যোগে আসে নি, আপনার বাপের বাড়ী থেকেই এসেছিল!"

হাতের বাসন ও কাচা কাপড়গুলি নামাইয়া রাখিতে যে সময়টুকু লাগিয়াছিল, বিশ্বেশ্বরী ততক্ষণ স্তব্ধ হইয়া বধূর দিকে চাহিয়াছিল। অতি বিস্ময়ে কিছুক্ষণ তাহার বাক্যস্ফূর্ত্তি হয় নাই! পদতলে সে যাহাকে টিপিয়া মারিতে পারে, এমন যে অসহায়, এতখানি কৃপার পাত্রী, সেই তাহার বধূ—আজ তাহার ন্যায় শাশুড়ীর মুখের উপর মুখ তুলিয়া সমান জবাব দিল!

সীমা উঠিতে না উঠিতে বাঘিনার মত তাহার উপর ঝাঁপাইয়া পড়িয়া দুই হাতে তাহার কণ্ঠ চাপিয়া ধরিয়া বিশ্বেশ্বরী কহিল,—"কি বললি, কালামুখী!"

সীমা তৎক্ষণাৎ সুকৌশলে আপনাকে মুক্ত করিয়া লইয়া দুই হাত যোড় করিয়া কহিল,—"ক্ষমা চাইছি, মা, যদি কোনও অন্যায় ক'রে থাকি; কিন্তু মিনতি করছি, মেছুনীর মতন মুখ ছুটিয়ে কেলেঙ্কার বাড়াবেন না।"

বিশ্বেশ্বরী নির্ব্বাক্! সীমার গলাখানি দুই হাতে টিপিয়া মেঝের উপর মুখটি তাহার ঘষিয়া দিবে, ইহাই ছিল তাহার একান্ত ইচ্ছা; কিন্তু সীমা যেন দশহস্তীর বল ধরিয়া তাহাকে পঙ্গু করিয়া দিয়া তাহাকেই আবার শাসাইতেছে! কত আর সে সহ্য করিতে পারে! উন্মাদিনীর মত আশেপাশে তাকাইতেই দেখিল, ঘরের চৌকাঠের পাশেই সুপুষ্ট শতমুখী রহিয়াছে, হিতাহিত জ্ঞান হারাইয়া তাহাই সাপটাইয়া ধরিয়া বধূকে আক্রমণ করিল। কিন্তু সীমা বোধ হয় প্রস্তুত হইয়াই ছিল, ক্ষিপ্রহস্তে তাহার ঝাঁটা সমেত হাতটি ধরিয়া, ঝাঁটাগাছটি কাড়িয়া লইয়া দূরে উঠানের উপর ফেলিয়া দিল। সঙ্গে সঙ্গে বিশ্বেশ্বরী আর্ত্তস্বরে

কাঁদিয়া উঠিল,—"ওগো মা গো, মেরে ফেললে গো—কি খুনে বউ গো!"

মা তখন পূজার ঘরে বসিয়া মালা জপিতেছিল, ঝগড়ার আলাপ পূর্ব্বেই তাহার কানে বাজিয়াছিল, উঠি-উঠি করিতেছিল, এমন সময় কন্যার আর্ত্তনাদ শুনিয়া সপ্তমে সুর চড়াইয়া দালানে আসিয়া দাঁড়াইল।

সীমার মূর্ত্তি আজ অন্যরূপ। সে তখন শাশুড়ীকে লক্ষ্য করিয়া বলিতেছিল,—"দেখুন মা, এক দিন এই বাড়ীতে আপনি যে অধিকারে ঢুকেছিলেন, আমিও সেই অধিকার নিয়ে এখানে এসেছি। আমার প্রতি আপনি যে সব ব্যবহার এত দিন করেছেন, আপনার শাশুড়ী তার শতাংশও যদি আপনার সম্বন্ধে করতেন, তা হ'লে প্রবৃত্তি আপনাকে কোন্ পথে নিয়ে যেত, তাই আজ মনে মনে ভাবুন। এইটুকু ভাববার দিন আজ এসেছে।"

তাহার পর কোনও দিকে ভ্রূক্ষেপ না করিয়া সীমা নিজের ঘরে গিয়া প্রবেশ করিল। মা ও মেয়ে মুহ্যমানা অবস্থায় তাহার গমনগতির দিকে তাকাইয়া রহিল।

চার

গোবর্দ্ধন বাড়ীতে প্রবেশ করিতেই মা ও দিদিমা তাহার সম্মুখে আছাড় খাইয়া পড়িয়া আর্ত্তকণ্ঠে তুমুল চীৎকার তুলিল। গোবর্দ্ধন ইহাতে চির-অভ্যস্ত হইলেও, অন্যকার ব্যাপার যে অন্যরূপ, তাহা মা ও দিদিমার অশ্রু হইতেই অনুমান করিয়াছিল। সীমার শাসন এ পর্য্যন্ত ইহারা অবাধে করিয়া আসিযাছে, বাড়ীতে পদার্পণ করিয়া গোবর্দ্ধন বরাবর ইহাদের তর্জ্জনই শুনিয়াছে। কিন্তু আজ এ কি আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন? শাসকের স্থান হইতে নামিয়া, আজ যে ইহারা সীমা'ক আসামী করিয়া আর্ত্তস্বরে অভিযোগ তুলিয়াছে! তবে কি সীমা আজ সত্যই সহ্যের সীমার বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে?

সীমার মুখে সমস্ত শুনিয়া গোবর্দ্ধন সহজভাবেই কহিল,—"অতুলটার স্বভাবই ঐ রকম। ওর সঙ্গে তোমার কথা কওয়াটাই ভাল হয় নি।".

সীমার সর্ব্বাঙ্গ আবার জ্বলিয়া উঠিল, ঝঙ্কার দিয়া কহিল,—"আমি কি সেধে ওর সঙ্গে কথা কইতে গিয়েছিলুম? মনে নেই—সব কথা? তোমার মায়ের পীড়াপীড়ি, দুর্জ্জয় জেদ,—নিরুপায় হয়ে আমি যখন তোমাকে এ কথা জানাই, কি বলেছিলে তখন তুমি—মনে পড়ে না?"

থতমত খাইয়া গোবর্দ্ধন কহিল,—"হাঁ-হাঁ, মনে পড়েছে বৈ কি,

মনে পড়েছে বৈ কি, আমিও তখন মা'র কথাতেই সায় দিয়েছিলুম, অতুলের সঙ্গে কথা কইতেই বলেছিলুম। কিন্তু এখন মনে হচ্ছে, আমার সে বলাটাই ভাল হয় নি।"

সীমা স্বামীর মুখের দিকে চাহিয়া রুদ্ধশ্বাসে জিজ্ঞাসা করিল,—"এর কি প্রতিকার করতে চাও তুমি ?"

গোবর্দ্ধন যেন আকাশ হইতে পড়িল ; পত্নীর দৃপ্ত মুখের দিকে চাহিতেই সে শিহরিয়া উঠিল। সীমার এমন মূর্ত্তি ত সে কোনও দিন দেখে নাই। কিন্তু সীমা বলে কি ? এমন কি অপরাধ অতুল করিয়াছে যে, তাহার প্রতিকারের জন্য কোমর বাঁধিতে হইবে। অথচ, সীমার সেই দৃপ্ত মুখের উপর প্রতিবাদ করিবার মত সাহসও তাহার ছিল না। অন্যদিকে মুখখানি ফিরাইয়া, মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে গোবর্দ্ধন আপন মনে বলিতে লাগিল, "ছোঁড়াটা সত্যিই ভারী বেয়াড়া হয়ে দাঁড়িয়েছে। কতকগুলো খারাপ সঙ্গী যুটেছে কি না। আচ্ছা, কালই আমি ওকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে ঠিক ক'রে দেব। কিন্তু ওকে কিছু বলতে যাওয়াও মুস্কিল ; আমাকে দেখলেই, হাতের ওপর হাত রেখে বক দেখায় !"

সীমার মনে হইল, যে সাপটা এতক্ষণ তাহার দেহের ভিতর কুণ্ডলী পাকাইয়া ফণা তুলিয়া গর্জ্জন করিতেছিল, পত্নীর অবস্থা জানিয়াও প্রতিকার সম্বন্ধে স্বামীর এই নিশ্চেষ্টতা ও উদাসীন উক্তি শুনিয়া সেই সাপটাও বুঝি লজ্জায় ঘৃণায় সোজা হইয়া তাহার পা বাহিয়া নামিয়া পলাইতেছে !—স্বামীর কথার কোনও উত্তর সে দিল না,—কিন্তু পলকশূন্য-নয়নে এমন এক অদ্ভুত দৃষ্টিতে সে তাহার

মুখের দিকে চাহিয়া রহিল যে, সেই মর্ম্মভেদী দৃষ্টির অর্থ অনুভব করিতে স্থূলবুদ্ধি গোবর্দ্ধনেরও কিছুমাত্র বিলম্ব হইল না।

কয়েক মুহূর্ত্ত চুপ করিয়া থাকিয়া গোবর্দ্ধন কহিল,—"সীমা, আমার যা কিছু পরিচয়, সবই ত তুমি পেয়েছ, কিছুই ত তোমার কাছে লুকিয়ে রাখি নি। তুমি ত জান, আমি সবই বুঝি; কিন্তু বুঝেও কিছুই আমি করতে পারি না। ভগবান্ আমাকে কোনও ঝঞ্ঝাট পোয়াতে পৃথিবীতে পাঠান নি। তুমি ত জান, আমি রাগতে জানি না, আর এও ঠিক যে, রাগ না হ'লে ঝগড়া করা যায় না। আমি এ পর্য্যন্ত কারুর সঙ্গে ঝগড়া করি নি, আমার কেউ শত্রু নেই। ভুলে যদি সাপের গায়ে পা দিই কেনোদিন, সেও সুড়্ সুড়্ ক'রে স'রে যায়, কামড়ায় না!"

যে সুরে গোবর্দ্ধন তাহার প্রকৃতির পরিচয় দিল, তাহা বুঝি সীমার উত্তেজিত চিত্তে কোমলতার এক অপূর্ব্ব ঝঙ্কার দিয়া তাহাকে কিছুক্ষণের জন্য তন্ময় করিয়া দিল। ভাবের এই অভিনব অভিব্যক্তির সঙ্গে সঙ্গে তাহার দুই চক্ষুর দৃষ্টিও যেন ম্লান ও আর্দ্র হইয়া গেল।

গোবর্দ্ধন বলিতে লাগিল,—"কত লোক কত কথাই আমাকে বলেছে, কিন্তু তাই নিয়ে আমি কোনও দিন কারুর সঙ্গে লড়াই করতেও ছুটিনি, তর্কও তুলিনি। মনে পড়ছে, আমার বে'র বছরে জামাই-ষষ্ঠীর দিন তোমার খুড়তুতো ভাই ট্যাঁপা, আমাকে নিতে এসেছিল। একে নতুন জামাই, তাতে আবার জামাইষষ্ঠীর নেমন্তন্ন, সাজ-গোছটা একটু ভালরকমেরই করেছিলুম, নতুন পাম্‌সু পায়ে চড়িয়েছিলুম,—ট্রেণ থেকে নেমে ট্রাম পর্য্যন্ত যেতে ঘেমেই

অস্থির, সেই অবস্থায় ডেয়োপিঁপড়ের মত এঁকে বেঁকে ট্রামে গিয়ে যখন চাপলুম, দু তিনটে কলেজের ছোঁড়া ত আমাকে দেখে হেসেই অস্থির! আমি অমনি পানের ডীপে না খুলে তিন জনকেই দু দু খিলি পান খেতে দিলুম। তারা ত অবাক্! আমি বল্লুম, এতে আশ্চর্য্য হবার কিছু নেই। মানুষ যে মানুষকে দেখে হাসে, এই প্রথম দেখছি, আর আপনারাই এর প্রদর্শক ব'লে, পান দিয়ে আপনাদের পূজো করছি।—ভদ্রলোকদের মুখে আর কথা নেই। পরের ষ্টপেজে ট্রাম থামতে না থামতেই দেখি—তারা নেমে যাচ্ছে।"

সীমা কহিল,—"তা হ'লে তোমার এই আখ্যায়িকা থেকে এইটুকুই কি আমাকে অনুমান ক'রে নিতে হবে যে, তোমার আদরের ভাইটির ঐ ব্যবহারের উত্তরে খিলি কতক পান সেজে নিয়ে গিয়ে খয়রাৎ করাই হচ্ছে আমার উপস্থিত কর্ত্তব্য ?"

গোবর্দ্ধন কহিল,—"কি মুস্কিল! আমি কি তাই বল্লুম তোমাকে? আমি বলিছি আমার কথা। আমার যেমন বুদ্ধি, যেমন প্রবৃত্তি, আমি করেছি সেই রকম ব্যবস্থা। এখন তোমার সম্বন্ধে কি করা উচিত, তুমি কি করবে, তার ব্যবস্থা করবার মত বুদ্ধি যদি আমার ঘটে থাকবে, তা হ'লে আজ কি তোমার এ অবস্থা হয়? তোমার মত স্ত্রী কটা সংসারে এসেছে? আবার তোমার মত কষ্ট কটা মেয়েই বা পেয়েছে?—আমি জানছি সব, বুঝছি সব, দেখছি সব,—কিন্তু কিছু ত করতে পারছি না!—একটা কায হয় ত পারি করতে, ক'দিন থেকেই তাই ভাবছি। একবার এগুই, সাতবার পেছুই। কিন্তু এবার স্থিরসঙ্কল্প, করবই,—"

"কাযটা কি আগে শুনি ?"

"কলকেতায় বাসা করা। মা-দিদিমার খরচ দিয়েও, একখানা বাড়ীর গোটা দুই ঘর ভাড়া নিয়ে যদি আমরা বাসা পাতি, কোনও কষ্ট হবে না। নিত্যি নিত্যি এ রকম ঝগড়াও বাধবে না, অতুলটাও আর জ্বালাতন করতে পারবে না।"

"আমার কাছে এ কথা বললে, ওঁদের কাছে কথাটা পাড়তে পারবে ? সাহস হবে ?"

"সত্যি ; আমার পক্ষে এ কাযটা, লড়াই করতে যাওয়ার চেয়েও শক্ত। কিন্তু তবু আমি এ কায করব। ওঁদের পায়ে ধ'রে মাথা খুঁড়ে মত আদায় করবই। তোমার এ কষ্ট আমি আর দেখতে পারব না।"

সীমা কিছুক্ষণ স্থিরদৃষ্টিতে গোবর্দ্ধনের দ্বিধা বিহ্বল মুখখানির দিকে চাহিয়া রহিল। স্থিরসঙ্কল্পের কিঞ্চিৎ আভা যেমন তাহাতে পড়িয়াছিল, সঙ্গে সঙ্গে ব্যথার একটা আভাযও যেন প্রকাশ পাইতেছিল। একটা দীর্ঘ- নিশ্বাস ফেলিযা দৃঢ়স্বরে সীমা কহিল,—"না, তোমাকে বাসা করতে হবে না। বাসায় আমি যাব না।"

গোবর্দ্ধন স্তম্ভিত হইয়া গেল। তাহার মনে এই ধারণাই বদ্ধমূল ছিল যে, স্বতন্ত্র বাসার কথা শুনিলে সীমা সকল কষ্ট ভুলিয়া আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিবে, মুখে প্রকাশ না করিলেও ইহাই হয় ত তাহার আকাঙ্ক্ষা ; কিন্তু সীমার মুখে এ ভাবে আপত্তি শুনিয়া তাহার অন্তর্নিহিত ধারণা আজ চূর্ণ হইয়া গেল। বিস্ময়ের সুরে সে প্রশ্ন করিল,—"বাসা করতেও দেবে না? বাসায় যেতে চাও না? কেন?"

সীমা গাঢ়স্বরে উত্তর দিল,—"একান্নবর্ত্তী সংসারে আমি মানুষ হয়েছি, কোনও রকম সঙ্কীর্ণতাকে মনেও কখনো প্রশ্রয় দিই নি। তোমার মা'র অন্যায় শাসন—অভদ্র অত্যাচার আমাকে অতিষ্ঠ ক'রে তুললেও স্বার্থপরের মত এমন প্রতিশোধ নেবার প্রবৃত্তি কোনও দিন আমার মনে জাগে নি। তিনটি বছর এ সংসারে এসে তাঁর চিরদিনের ছেলেকে ছিনিয়ে নিয়ে আমি তাঁকে ব্যথা দিতে পারব না।"

সীমার মুখের দিকে মুগ্ধ দৃষ্টিতে চাহিয়া গোবর্দ্ধন প্রশ্ন করিল, "তা হ'লে তুমি এখানে কি চাও?"

আর্ত্তস্বরে সীমা কহিল,—"কি চাই?"—সঙ্গে সঙ্গে তাহার দুই চক্ষু জলে ভরিয়া আসিল, সেই জলভরা দৃষ্টিতে স্বামীর দিকে চাহিয়া সে উচ্ছ্বসিতকণ্ঠে বলিয়া উঠিল, উত্তর দিল,—"আমি যে এই সংসারই চাই, এই সংসারে থেকেই সর্ব্বসুখী হ'তে চাই - সকলকে সুখী করতে চাই।"

পাঁচ

পর দিন প্রত্যুষের প্রথম ট্রেণেই বিশ্বেশ্বরী কালীঘাটে কালী-দর্শনে গেল। কি অভিপ্রায়ে এই পুণ্য অর্জ্জনে তাহার যাত্রা, সংসারের কল্যাণ-কামনায়, কিম্বা বধূ সীমার নিকট পরাজয়ের অবমাননার প্রতিবিধিৎসার জন্য, তাহা অপ্রকাশই রহিয়া গেল।

তীর্থের উদ্দেশে যাত্রায় চলচ্ছক্তি এলোকেশী অনেক দিন পূর্ব্বেই হারাইয়াছিল,—গৃহমার্গে বধূশাসনকালে পদযুগল কিন্তু লুপ্ত শক্তি পুনরায়ত্ত করিয়া সকলকেই চমৎকৃত করিয়া দিত!

সীমা পূর্ব্বদিনের কথা সমস্ত ভুলিয়া দিদিশাশুড়ীর অঙ্গসেবা ও উদরসেবার ব্যবস্থায় অবহিত হইলেও এলোকেশী তাহার পূর্ব্ব দিনের ব্যবহার ভুলিতে পারে নাই। বধূর হাতের জল গ্রহণ করিবে না, এই সঙ্কল্প করিয়াই বৃদ্ধা মালা লইয়া বসিয়াছিল। কিন্তু ছেলে-মেয়েরা রাগ করিয়া আহার সম্বন্ধে মৌখিক বীতস্পৃহার ভাব দেখাইয়া বাঁকিয়া বসিলে, মা যেমন স্নেহ ও শাসন দুটিরই আশ্রয় লইয়া তাহাদের জেদ ভাঙিয়া দেয়,—সীমাও আজ সেই পন্থার অনুসরণ করিয়া বৃদ্ধার স্নান ও ভোজন দুই পর্ব্বই যথাযথভাবে সম্পন্ন করিয়া দিল।

জোর-জবরদস্তি করিয়া স্নান করাইয়া বৃদ্ধাকে ভাতের পাথরের সম্মুখে বসাইবার সময় বৃদ্ধার সে কি ঝঙ্কার,—চিড়িয়াখানায় বাঘগুলির পিঁজারায় আহার যোগইবার সময় তাহারাও বুঝি এইভাবে গর্জ্জাইয়া উঠে! কিন্তু বৃদ্ধার মুখঝাপ্‌টায় সীমার কিছুমাত্র ভ্রূক্ষেপ নাই, ভাত ভাঙিয়া, তরকারি মাখিয়া বুড়ীর মুখে জোর করিয়া গুঁজিয়া দেয়, আর সান্ত্বনার সুরে বলে,—"আগে ত গাল কতক গিলে নাও, দিদিমা! তার পর যা বলবার ব'ল। কাল রাত থেকে দাঁতে ত একটা কুটোও কাট নি, নাতবৌকে গালাগাল দেবে কিসের জোরে? তাই না জোর করে গেলাতে বসেছি তোমাকে।"—বৃদ্ধা তখন অবাক্ হইয়া সীমার মুখের দিকে চাহিয়া থাকে, তাহার মুখ দিয়া আর কথা সরে না; সীমার হাতের গ্রাস দেখিতে দেখিতে নিঃশেষ হইয়া যায়!

বুড়ীকে খাওয়াইয়া, তাহার শয়নের ব্যবস্থা করিয়া দিয়া, সীমা স্নানের উদ্যোগ করিতেছে, এমন সময় তাহাদের এক খাতক এক

জোড়া গঙ্গার টাটকা ইলিস উপঢৌকন দিয়া গেল। মাছ দুটি কুটিয়া রাখিয়া স্নান সারিয়া সীমা রান্নাঘরে সে'গুলি ভাজিতে বসিল।

ঘরের ভিতর বিছানো মাদুরটির উপর অঙ্গ ঢালিয়া বুড়ী মনে মনে হিসাব করিতেছিল, মেয়ে কালীদর্শন করিয়া আসিলে, তাহার প্রতি সীমার অত্যাচারকাহিনী কি ভাবে প্রকাশ করিবে! এমন সময় রান্নাঘরে তেলের কলকলানি শব্দে তাহার চিন্তার সূত্র ছিন্ন হইয়া গেল। ধড়মড় করিয়া মাদুরের উপর উঠিয়া বসিয়া এলোকেশী কণ্ঠস্বর যথাসম্ভব কঠোর করিয়া প্রশ্ন করিল,—"বলি, ঠিক দুপুর-বেলায় রান্নাঘরে কড়ায় তেল চাপিয়ে কিসের ছেরাদ্দ পাকানো হচ্ছে?"

সীমাও সঙ্গে সঙ্গে দিদি-শাশুড়ীর শ্রুতিস্পর্শ হয়, এমন সুরে উত্তর দিল,—"এই যে, দিদিমার পেটে ভাতের রস পড়তে না পড়তেই দেখছি জোর তার জানিয়ে দিচ্ছে! তা, তোমার শ্রাদ্ধ করবার ত অবসর এ পর্য্যন্ত পেলুম না, তাই মনের দুঃখে মাছের শ্রাদ্ধই করতে বসেছি।"

ভাজা ইলিসের গন্ধে তখন বাড়ী ভরিয়া গিয়াছিল। বুড়ী বুঝিয়া পুনবায় তাহার স্বভাবসিদ্ধ স্বরে প্রশ্ন করিল,—"এ অবেলায় কোন্ স্যাঙাৎ তোমার ইলিস মাছ যুগিয়ে গেল?"

সীমাও জবাব দিল,—"তোমার সঙ্গে যে ছাঁতনাতলায় দাঁড়িয়েছিল, সেই বুঝি পাঠিয়ে দিয়েছে, দিদিমা!"

কথাটা গায়ে না মাখিয়া অথবা স্পষ্ট শুনিতে না পাইয়া বৃদ্ধা পুনরায় প্রশ্ন নিক্ষেপ করিল,—"বলি, পিণ্ডি গেলা হবে কখন্?"

সীমা তৈলপরিপূর্ণ কড়ায় মাছগুলি উল্টাইয়া দিতে দিতে

কহিল,—"তোমার পিণ্ডি ত আগেই পেড়েছি, দেড়টার গাড়ীতে পুণ্য ক'রে মেয়ে তোমার ফিরছেন, তাঁরও পিণ্ডির ব্যবস্থা ক'রে তার পর ত নিজের পিণ্ডির জোগাড় করব। তা, তোমাব পেট ত ঠাণ্ডা হয়েছে, দিদিমা। এখন চুপটি ক'রে মুখ বুজিয়ে লক্ষীটির মতন ঘুমিয়ে পড়, নইলে মাছ ভাজতে ভাজতে আবার আমায় ছুটতে হবে ঘুম পাড়াবার জন্য তোমাকে চাপড়াতে এই আঁস হাতেই!"

বৃদ্ধা মনে মনে কি ভাবিয়া আর কোনও কথা না তুলিয়াই শুইয়া পড়িল।

সহসা চাপা হাসি শুনিয়া সীমা সচকিত হইয়া পেছনের জানালাটির দিকে ফিরিয়া চাহিল। দেখিল—দুই হাতে জানালার গরাদ ধরিয়া দাঁড়াইয়া অতুল হাসিতেছে। সীমার সর্ব্বাঙ্গ শিহরিয়া উঠিল, সঙ্গে সঙ্গে যেন একজোড়া অগ্নিময় শলাকা তাহার উভয় পদতল ভেদ করিয়া মস্তিষ্ক পর্য্যন্ত ছুটিয়া গেল!

অতুল লুব্ধদৃষ্টিতে সীমার দিকে চাহিয়া হাসিতে হাসিতে কহিল,—"সত্যি বৌদি, তোমার কথা কইবার কায়দা সত্যিই ওয়াণ্ডারফুল! একেবারে ম'রে যাই—ম'রে যাই গোছের!—যাচ্ছিলুম তোমার রান্নাঘরের পাশ দিয়ে, তোমার মিঠে-কড়া বকুনী শুনে দাঁড়িয়ে পড়লুম—পা আর কি এগোতে চায়? সঙ্গে সঙ্গে ভাজা ইলিসের সুগন্ধ; যাকে বলে সোনায় সোহাগা!"

সীমা স্থির দৃষ্টিতে অতুলের দিকে চাহিয়া কহিল,—"এখন কি হুকুম শুনি?"—কথাগুলি বুঝি সে অভিভূতের মতই বলিয়াছিল, তাহার সর্ব্বশরীর তখনও একটা অননুভূত উত্তেজনায় কাঁপিতেছিল,

বুকের ভিতর তপ্ত রক্তস্রোত চঞ্চল হইয়া উদ্দামগতিতে ছুটিতেছিল।

সীমার প্রশ্ন অতুলকেও একান্ত অভিভূত করিয়া দিল, সে যেন কোনও দুষ্প্রাপ্য দুর্লভ বস্তু চক্ষুর সম্মুখে দোদুল্যমান অবস্থায় দেখিল,—হাত বাড়াইয়া আয়ত্ত করিলেই হয়! দুই দন্তপাটি বিকাশ করিয়া সে গদগদস্বরে কহিল,—"হুকুম আমার, না তোমার? জহুরীই জহর চেনে, আমি কালকেই এক আঁচে তোমাকে চিনে ফেলেছি। ভারী সুযোগটা কাল কিন্তু ফস্‌কে গেছে। ভূতনী পিসীটা যদি ভূতের মতন সে সময় এসে না পড়ত—"

দেহের সমস্ত সম্বিৎ রুদ্ধ করিয়া অস্বাভাবিক স্বরে সীমা জিজ্ঞাসা করিল,—"তা হ'লে কি করতেন?"

দুই চক্ষুর দৃষ্টিটা যতদূর সম্ভব কুৎসিত করিয়া, মুখে একটা কদর্য্য হাসি টানিয়া আনিয়া অতুল উত্তর দিল,—"কি করতুম? শুনতে চাও শুধু, না—আচ্ছা, থাক সে কথা এখন, আবার কে এসে পড়বে এখুনি। হাঁ, শোধবোধ ত হয়ে যাক্ আগে। পোড়া-সিগারেট তোমাকে ভেট দিয়েছি কাল, তুমি বৌদি তার বদলে ভাজা ইলিস্ মাছ খান কতক হাতে তুলে দাও, তা হলেই বুঝব—তুমি আমার ওপর রাগ করনি, রাজী—"

মুখের কথার সঙ্গে সঙ্গে সে জানালার গরাদের ভিতর দিয়া উভয় হস্তের অঞ্জলি পাতিল।

চকিতের মধ্যে সীমা উনানের কিনারা হইতে লোহার বড় হাতাখানা টানিয়া কটাহের মধ্যে ডুবাইয়া দিল। সঙ্গে সঙ্গে

অতুলের দিকে চাহিয়া মুখ মচকাইয়া হাসিয়া কহিল,—"সত্যি ঠাকুরপো, আজ শোধবোধই বটে !"

মেঘের বুক চিরিয়া যে বিদ্যুৎ বাহির হইয়া আকাশ-মেদিনী কাঁপাইয়া দেয়, সীমার মুখের এই হাসিটুকুও যে তেমনই ভয়াবহ হইয়া একটা আর্ত্ত আরাবের সৃষ্টি করিবে—অতুল তাহা কল্পনাও করে নাই।

বিদ্যুতের সঙ্গে সঙ্গে অশনি যেমন ভীষণ নিনাদ তুলিয়া বিশ্বের নিস্তব্ধতা ভাঙিয়া চূর্ণ করিয়া দেয়, সীমার মুখের হাসির ঝিলিকটুকুও তেমনই তাহার মুখের মিষ্ট কথা কয়টির সঙ্গে সঙ্গে নিপুণ হস্তের অপূর্ব্ব পরিবেষণে মধ্যাহ্নের স্তব্ধতা চূরমার করিয়া দিল। লোহার হাতায় ভরা ফুটন্ত তৈলের সহিত কয়েকখণ্ড ইলিস্ অতুলের যুক্ত করপুটে পড়িবামাত্রই তাহার কণ্ঠনিঃসৃত হৃদয়ভেদী আর্ত্তনাদে সেই স্থানটি মুখরিত হইয়া উঠিল।

ছয়

তখন অপরাহ্ণ। গোবর্দ্ধনের বাড়ীর উঠানে আজ আর লোক ধরে না। পাড়ার ছেলে-বুড়ো, মেয়ে-পুরুষ সবাই আসিয়া বার দিয়া বসিয়াছে। শনিবার বলিয়া গোবর্দ্ধনও পৌনে তিনটের গাড়ীতে বাড়ী ফিরিয়াছে। বিশ্বেশ্বরী কালীদশন করিয়া দেড়টার ট্রেণেই ফিরিয়াছিল। কিন্তু যে উৎসাহ লইয়া সে কালীদর্শনে গিয়াছিল, তাহা হারাইয়া মর্ম্মান্তিক অবসাদ ও মনস্তাপ লইয়া অতি কষ্টে বাড়ী ফিরিয়াছে। গাড়ী হইতে নামিবার সময় পাদানি

হইতে পা পিছলাইয়া সে প্লাটফরমে পড়িয়া গিয়াছিল, কোনও রকমে বাঁচিয়া গিয়াছে বটে, কিন্তু অদৃষ্টের অত্যাচার সর্ব্বাঙ্গে 'দাগরাজি' করিয়া দিয়াছে, তুইখানি হাত একেবারে থেঁতলাইয়া গিয়াছে। ষ্টেশনমাষ্টার ডুলি করিয়া একজন পোর্টার সঙ্গে দিয়া তাহাকে বাড়ী পাঠাইয়া দেন। ডাক্তার আসিয়া তুই হাতে ব্যাণ্ডেজ বাঁধিয়া দিয়াছেন। সীমা সর্ব্বকর্ম্ম ত্যাগ করিয়া শাশুড়ীর শয্যা আশ্রয় করিয়া বসিয়াছে।

অতুলের হাতের চেটো-তুইখানি হিঙ্গের কচুরীর মত ফাঁপিয়া উঠিয়াছিল,—যন্ত্রণায় অধীর হইয়া সে জলে লাফাইয়া পড়ে। তাহার আর্ত্তনাদে পাড়ার লোকজন ছুটিয়া আসে। জলের সংস্পর্শে জ্বালা আরও বাড়িয়া যায়, ফোস্কা ছিঁড়িয়া ঘা হইয়া উঠে। যে ডাক্তার বিশ্বেশ্বরীর হাতে ব্যাণ্ডেজ বাঁধিয়া দিয়াছেন, তিনিই নিপুণহস্তে অতুলের হাতের ফোস্কার উদ্গত চামড়াগুলি কাটিয়া বাঁধিয়া দিয়াছেন। সীমার বিরুদ্ধে তাহার অভিযোগ গুরুতর। দালানের সোপানশ্রেণী আশ্রয় করিয়া অর্দ্ধ-অচৈতন্তের মত সেও পড়িয়া আছে।

অতুলের তীব্র আর্ত্তনাদ শুনিয়া সন্নিহিত প্রতিবেশিনীরা যখন অকুস্থলে ছুটিয়া আসে, এবং অতুল অসীম যন্ত্রণা সহ্য করিয়াও যখন সীমার সম্বন্ধে একটা কুৎসিত ও মিথ্যা প্রসঙ্গ তুলিয়া সকলের সহানুভূতি আকর্ষণের প্রয়াস পায়, ভূতনী পিসীও ঠিক সেই সময়টিতে গোলযোগ শুনিয়া সীমার বাড়ীতে প্রবেশ করিয়াছিলেন। ইহারই অব্যবহিত পরে বিশ্বেশ্বরীর ডুলি বাড়ীতে আসিয়া পড়ে, এবং ভূতনী পিসীর সময়োচিত সহায়তায় সীমাকেই সকল ব্যবস্থা

সম্পন্ন করিতে হয়। সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত পল্লীই সচকিত ও উদ্বেলিত হইয়া উঠে।

পল্লীর সমবেত মাতব্বররা বার বার সীমাকে আহ্বান করিয়াও যখন তাহার কোনও সাড়া পাইলেন না এবং সীমাও শাশুড়ীর শয্যা ত্যাগ করিয়া বাহিরের মজলিসে দেখা দিবার কোনও আভাস প্রকাশ করিল না, তখন তাঁহারা বিচলিত হইয়া গোবর্দ্ধনকে কহিলেন,—"তোমার স্ত্রীর সম্বন্ধে অতুল যে সব কথা বলছে, তার একটা মীমাংসা এখনই হয়ে যাওয়া উচিত গোবর্দ্ধন; এ কেলেঙ্কারীর ব্যাপার যদি থানা-পুলিস পর্য্যন্ত গড়ায়, তা হ'লে কি সেটা ভাল হবে? তুমি নিজে গিয়ে, তোমার স্ত্রীকে এখানে ডেকে আনো, এখন লজ্জা দেখাবার সময় নয়।"

গোবর্দ্ধন ঘরে ঢুকিয়াই দেখিল, মা তাহার তখনও সেই ভাবেই আচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়া আছেন, সীমা তাঁহার শয্যাপার্শ্বে বসিয়া প্রয়োজনমত শুশ্রূষা করিতেছে। গোবর্দ্ধন এই অবস্থায় কথাটা পাড়িতেই, যাহার কণ্ঠস্বর শুনিল, সচকিতে তাহার দিকে চাহিয়াই সে শিহরিয়া উঠিল। ঘরের অন্তপ্রান্তে বসিয়া ভূতনী পিসী যে সীমার হাতের কতকগুলি কায গুছাইতেছিলেন, সে দিকে গোবর্দ্ধনের লক্ষ্য পড়ে নাই! ভূতনী পিসী কহিলেন,—"কেন, জবাব কি তোমার মুখে জোগালো না?—কি করা হচ্ছিল ওখানে এতক্ষণ ঐ জটলার ভেতর ব'সে, মেনী-মুখো মিন্‌ষে? যা—ওদের গিয়ে বল—সীমার বয়ে গেছে ওখানে গিয়ে দাঁড়াতে; যে যাবার, সে যাচ্ছে।"

ভূতনী পিসীর মুখের উপর প্রতিবাদ তুলিয়া কথা কহিবার সাধ্য পল্লীর বর্ষীয়ান্ সমাজপতিরও ছিল না, গোবর্দ্ধন ত সর্ব্বজনবিদিত চক্ষুলজ্জা-শীল নিরীহ বেচারী! মুখটি নীচু করিয়া সে পলাইয়া যেন পরিত্রাণ পাইল।

প্রকৃতপক্ষে এই গণ্ডগ্রামটির সকল বিষয়েই সর্ব্বেসর্ব্বা ও সর্ব্বশক্তিসম্পন্না ছিলেন পতিপুত্রহীনা অসাধারণ মনস্বিনী এই ভূতনী পিসীটি! সরকারী জরীপের সময় আমীনদের অভিযান যখন পল্লীকে সন্ত্রস্ত করিয়া তুলে, তখন জমীজমার স্বত্বস্বামিত্ব সম্বন্ধে এই ভূতনী পিসীর সর্ব্বজ্ঞতাই পল্লীবাসীর দলিল-স্বরূপ হইয়া তাহাদের অধিকার সাব্যস্ত করিয়া দেয়। যে উচ্চপদস্থ রাজকর্ম্মচারী জরীপের কর্ত্তা হইয়া এই সারকেলে আসিয়াছিলেন, তিনি মুক্তকণ্ঠে বলিয়া যান,—'অনেক মহকুমাতেই আমি সারকেল অফিসারের কায করেছি, কিন্তু এমনটি কোথাও দেখি নি। এই মনস্বিনী মহিলাটি উচ্চ শিক্ষার সঙ্গে পরিচিতা না হয়েও, জমী-জমা সম্বন্ধে যে অভিজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন—প্রজাদের স্বার্থ বজায় রাখতে অপক্ষপাতে যে সব কায করেছেন, তার পরিচয় পেয়ে আমি বিস্মিত হয়েছি।'—ফলতঃ, সে যাত্রা ইঁহারই প্রচেষ্টায় জমীদার বৈধ অবৈধ নানাবিধ উপায় অবলম্বন করিয়াও মহেশখালীর প্রজাদের কোনও প্রকার স্বার্থহানি করিতে সমর্থ হন নাই। এই ভাবে এই গ্রামটির যাহা কিছু অনুষ্ঠান, গ্রামবাসীদের সম্পদে বিপদে সকল ব্যাপারেই ইনি একান্ত অপরিহার্য্য হইয়া উঠিয়াছিলেন।

সুতরাং ভূতনী পিসী যখন বাহিরে আসিয়া, পল্লী-মাতব্বরদের

সম্মুখে দাঁড়াইয়া, সীমার স্বপক্ষে সাফাই সাক্ষ্য দিলেন—বকুল-পুকুরের সেই দুর্য্যোগময় অপরাহ্ণে তাঁহার নিজের দেখা ঘটনার বর্ণনা করিয়া অদ্যকার ব্যাপারটিও ব্যক্ত করিলেন, অতুলের যন্ত্রণা-ক্লিষ্ট মুখখানি তখন কাগজের মত যেমন শাদা হইয়া গেল, সমবেত সকলেরই মুখে তেমনই উল্লাসের হাসি ফুটিয়া উঠিল। ভূতনী পিসী কহিলেন,—"ঐ হতভাগা অনামুখোর কথায় বিশ্বাস ক'রে তোমরা এসেই নির্লজ্জের মত যার বিচার করতে এসেছ, আমি এসেছি তার এই আখ্যেন শুনে তাকে কোলে ক'রে নাচতে। আর আমি ডাক ছেড়ে বলছি, পাড়ার বউ-ঝিরা নিত্যি এসে, সীমার চন্নামৃত মাথায় দিয়ে তার কাছে শিখুক কি ক'রে ইজ্জত রাখতে শক্ত হ'তে হয়—কেমন ক'রে এত ঝড়-ঝাপটা দুঃখ-কষ্ট সয়েও সংসার করতে হয়।"

চিত্ত শুদ্ধ রাখিয়া যে যাহা চাহে, বুঝি তাহা অপূর্ণ থাকে না। সীমা চিরদিন যাহা চাহিয়া আসিয়াছে—বহু বাধা-বিঘ্ন ও নির্য্যাতনের মধ্য দিয়াই সে তাহা এত দিনে পাইয়াছে। সীমার অসীম সেবার মাধুর্য্য উপলব্ধি করিয়া বিশ্বেশ্বরী যে দিন উঠিয়া বসিল, তখন আর সে আগের মানুষ নহে! সীমা কাছে আসিতেই তাহার মাথার উপর শিথিল হাতখানি রাখিয়া কহিল,—"শোনো বউ-মা, এই হাতে অর্ঘ্য সাজিয়ে মায়ের পায়ে দিয়েছিলুম তোমার দর্প চূর্ণ করতে—তোমাকে বশ করতে। সেই থেকে এই তিনটি মাস নিত্যি স্বপ্নে দেখেছি—মা যেন আমার হাতের অর্ঘ্য তোমার মাথার ফেলে দিচ্ছেন, আর তুমি তাঁর কোল-জুড়ে ব'সে। আজ আমি দিব্য জ্ঞান পেয়েছি, বউ-মা! মা আমাকে জানিয়ে

দিয়েছেন, সংসারের লক্ষ্মী ব'লে যাকে আমরা বরণ ক'রে আনি, তার খোয়ার করলে—খোয়ার করা হয় ,মহামায়ীর! আর নয় মা,—আমাদের ছুটী,—এ সংসার—তোমার।"

সীমা ভূমিষ্ঠ হইয়া শাশুড়ীর পদতলে মাথা রাখিয়া তাঁহার পদধূলি গ্রহণ করিল।

সমাপ্ত